॥ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচয় ॥

॥ প্রথম খণ্ড ॥

প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি [এলাহাবাদ], প্রাচীন কলাকেন্দ্র [চণ্ডীগড়]
সুরের মায়া সঙ্গীত সমাজ [কলিকাতা] এবং অন্যান্য অনুমোদিত
সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথম হইতে
চতুর্থ বর্ষ পরীক্ষার্থীদের জন্য।

॥ শ্রীইন্দুভূষণ রায় ॥
সঙ্গীত বিশারদ [লক্ষ্ণৌ]
সঙ্গীত প্রভাকর [এলাহাবাদ]

॥ অধ্যক্ষ ॥
॥ কলা ভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ★ ধান্যকুড়িয়া ॥
॥ সঙ্গীত ভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ★ বসিরহাট ॥

প্রথম প্রকাশ :
২রা পৌষ-১৩৮২

প্রকাশিকা :
সঙ্গীতা রায়
কলাভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
পোঃ ধান্যকুড়িয়া, জেলা ২৪পরগণা

মুদ্রক :
সুধাতোষ বসু
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

পরিবেশক :
কলাভারতী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
পোঃ ধান্যকুড়িয়া, ২৪পরগণা

এস, চন্দ্র এণ্ড কোং
৪নং ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯

নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দে বুক ষ্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী
১১০, বিধান সরণী [শ্যামবাজার]
কলিকাতা-৪

যে সব গুণী শিল্পী রবীন্দ্রনাথের
গান প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন
তাঁহাদেরই পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

গ্রন্থকারের অন্যান্য সঙ্গীতগ্রন্থ ঃ—

[১] সঙ্গীত শাস্ত্র ঃ (প্রথম খণ্ড) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ।

[২] সঙ্গীত শাস্ত্র ঃ (দ্বিতীয় খণ্ড) তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষ।

[৩] সঙ্গীত শাস্ত্র ঃ (তৃতীয় খণ্ড) পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষ।

ভূমিকা

আজকাল রবীন্দ্রনাথের গান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ব্যাপক ভাবে চর্চাও হচ্ছে, এটা খুবই আনন্দের কথা। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের ঔপপত্তিক ও তত্ত্বীয় দিকটাও শেখার বা জানার খুবই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নানা লেখকের নানা গ্রন্থে যে সব বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে সেগুলির একত্র সমাবেশ বড় একটা দেখা যায় না। সকল রকম শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সুবিধার জন্য সহজ সরল ভাষায় রবীন্দ্র-সংগীত সম্পর্কে নানান তথ্যের আলোচনা করেছেন শ্রীইন্দুভূষণ রায় তাঁর "রবীন্দ্রসংগীত পরিচয়" পুস্তকটিতে। পরীক্ষার্থীদের কাছে এই ধরণের পুস্তকের যে প্রয়োজন ছিল, আশা করি, এই পুস্তকের মাধ্যমে তা' পূরণ হবে।

তাঁর এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্‌ ও পুস্তকটি সকলের কাছে সমাদর লাভ করুক—এই কামনা করি।

প্রসাদ কুমার সেন

১৬. ১২. ১৯৭৫

অধিবচন

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে "রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচয়" গ্রন্থখানি ক্রমিক দুই খণ্ডে রচনা করেছি। বর্তমানকালের বিভিন্ন পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষার্থীরা ঔপপত্তিক বিষয়ের যে কোন পাঠক্রমের, যে কোন প্রশ্নের সন্তোষজনক এবং উন্নতমানের উত্তর এই গ্রন্থ হতে দিতে সক্ষম হবে।

যাঁরা সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ই অবশ্য অজানা নয়। কিন্তু পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীকে প্রস্তুত করার জন্য আমার এই গ্রন্থকে উপযুক্ত সহযোগী বিবেচনা করবেন, এই বিশ্বাসেই আমি গ্রন্থটি তাঁদের কাছে উপস্থাপিত করছি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এই গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

এই গ্রন্থ রচনার কাজে আমার নিজের জ্ঞান ও দীর্ঘকাল সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়াও যাঁদের সহায়তা পেয়েছি তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ডঃ জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ [এম. এ., ট্রিপল], পি. এইচ. ডি এবং বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগের স্বরলিপি দপ্তরের অন্যতম কর্মী শ্রীসুভাষ চৌধুরী প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে পূর্ব আচার্যদের লিখিত অনেক গ্রন্থ ও পত্রিকা হতে নান সাহায্য গ্রহণ করেছি তার জন্য তাঁদের কাছে আমি বিশেষভাবেই ঋণী। প্রখ্যাত পুস্তক পরিবেশক শ্রী এস. চন্দ্র এই গ্রন্থ রচনায় প্ররোচিত করেছেন এবং সঙ্গীতরসিক শ্রীজয়ন্ত বেরা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন।

পরিশেষে পরমপূজ্য রবীন্দ্রসঙ্গীতগুরু শ্রীপ্রসাদ সেন মহাশয়কে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। যাঁর মূল্যবান উপদেশ ও আশীর্বাদ নিয়ে আমি এই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছি। তাছাড়া গ্রন্থের একটি অনবদ্য ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন ও গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন।

অলমতি বিস্তরেণ

শ্রীইন্দুভূষণ রায়

প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতির রবীন্দ্রসঙ্গীতের কণ্ঠ ও গীটারের পাঠক্রম

।। প্রথম বর্ষ ।।

[ক্রিয়াত্মক। পূর্ণমান—১০০]

[১] স্বরজ্ঞান :—৭টি শুদ্ধ স্বর ও পাঁচটি বিকৃত স্বরের জ্ঞান।

[২] তিনটি সরল অলঙ্কার।

[৩] বিলাবল ও কল্যাণ ঠাট গাহিবার অভ্যাস।

[৪] ৭টি রবীন্দ্রসঙ্গীত—নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রস্তুত করিতে হইবে। পূজা—একটি, বিচিত্র—একটি, স্বদেশ—একটি, প্রেম—একটি, প্রকৃতি—দুইটি, আনুষ্ঠানিক—একটি।

[৫] নিম্নলিখিত প্রত্যেক তালে অন্তত একটি করিয়া গান গাহিবার অভ্যাস :—দাদরা, কাহারবা, তেওরা, ঝম্পক।

[শাস্ত্র। পূর্ণমান—৫০]

[১] পরিভাষা :—সঙ্গীত, ভারতীয় সঙ্গীতের মুখ্য পদ্ধতি, ধ্বনি, নাদ, শ্রুতি, স্বর, সপ্তক, ঠাট, অলঙ্কার, বর্ণ, তাল, মাত্রা, সম, তালি, খালি, ঠেকা, আরোহ, অবরোহ।

[২] রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব। ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের পরিচয়।

।। দ্বিতীয় বর্ষ ।।

[ক্রিয়াত্মক। পূর্ণমান—১০০]

[১] শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের বিশেষ জ্ঞান।

[২] খাম্বাজ ও কাফী ঠাট গাহিবার অভ্যাস।

[৩] পাঁচটি কঠিন অলঙ্কার।

[৪] প্রথম বর্ষের সমস্ত তাল ও গীতের অতিরিক্ত অন্য সাতটি গান। নিম্নলিখিত বিষয়ে গাহিবার অভ্যাস। পূজা—দুইটি, প্রেম—দুইটি, প্রকৃতি—তিনটি।

[৫] নিম্নলিখিত তালে প্রত্যেকের একটি করিয়া গীত—ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, ষষ্ঠীতাল, রূপক তাল।

[শাস্ত্র। পূর্ণমান—৫০]

[১] প্রথম বর্ষের সকল পরিভাষার বিশেষ জ্ঞান।

[২] আকারমাত্রিক স্বরলিপি ; বিষ্ণুদিগম্বর অথবা ভাতখণ্ডে স্বরলিপির বিশেষ জ্ঞান।

[৩] ভানুসিংহের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রেমের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রাদেশিক সঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব।

[৪] তানপুরা, খোল, পখাবজ ও তবলার বর্ণনা।

।। তৃতীয় বর্ষ ।।

[ক্রিয়াত্মক। পূর্ণমান—১০০]

[১] সাতটি কঠিন অলঙ্কার।

[২] ভৈরব, ভৈরবী ও পূর্বী ঠাট গাহিবার অভ্যাস।

[৩] প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সমস্ত তাল ও ১৪টি গানের অতিরিক্ত আর সাতটি গান নিম্নলিখিত বিষয়ে গাহিতে হইবে—পূজা—পাঁচটি, বিচিত্র—একটি, প্রকৃতি=একটি।

[৪] নিম্নলিখিত তালে প্রত্যেকের একটি করিয়া গান গাহিবার অভ্যাস :—একতাল, ঝাঁপতাল, নবতাল।

[শাস্ত্র। পূর্ণমান—৫০]

[১] প্রথম হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রীয় বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা।

[২] পরিভাষা :—রাগ, কাব্যসঙ্গীত; লোকসঙ্গীত, ভাবসঙ্গীত, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, তান, ছন্দ, লয়।

[৩] এসরাজ, দিলরুবা, একতারা ও আনন্দলহরীর বর্ণনা।

[৪] গীতিনাট্য সম্বন্ধে আলোচনা :—"বাল্মীকি-প্রতিভা", "কালমৃগয়া", "মায়ার খেলা"।

[৫] রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য বিষয়ে জ্ঞান :—চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা।

॥ চতুর্থ বর্ষ ॥

[ক্রিয়াত্মক। পূর্ণমান—১০০]

[১] ভৈরব, ইমন, খাম্বাজ, বিলাবল, কাফী ও ভৈরবী রাগে এক-একটি ছোট খেয়াল।

[২] পূর্বী, মারবা ও তোড়ী ঠাটের আরোহ অবরোহ গাহিবার বিশেষ অভ্যাস।

[৩] প্রথম হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত বিভিন্ন তাল ও বিষয়ের ২১টি গানের অতিরিক্ত আর সাতটি গান নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। পূজা—পাঁচটি, স্বদেশ—একটি, আনুষ্ঠানিক—একটি।

[৪] নিম্নলিখিত তালে এক-একটি গীত অভ্যাস করিতে হইবে। ধামার, চৌতাল, সুরফাঁকতাল, একাদশী।

[শাস্ত্র। পূর্ণমান—৫০]

[১] প্রথম হইতে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রীয় বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান।

[২] রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রসঙ্গীতে গুরু পরম্পরা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরলিপি ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলাকারের স্বতন্ত্রতা বিষয়ে বিশেষরূপে আলোচনা।

[৩] রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তন ও বাউল গানের প্রভাব।

[৪] রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল ও স্বরের সৃজন প্রতিভার আলোচনা।

[৫] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের রচনায় হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব।

[৬] রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের আলোচনা।

[৭] আকারমাত্রিক স্বরলিপি, বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপি ও ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির তুলনা।

[৮] তানপুরা মিলাইবার বিশেষ জ্ঞান।

সূচীপত্র

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিচয়

॥ প্রথম বর্ষ ॥

স্বরজ্ঞান

সাতটি শুদ্ধ স্বর : সা রা গা মা পা ধা না।

পাঁচটি বিকৃত স্বব : কোমল ঋষভ=ঋা, কোমল গান্ধার=জ্ঞা, তীব্র মধ্যম=হ্মা কোমল ধৈবত=দা, এবং কোমল নিষাদ=ণা।

অলঙ্কার

১. সরগা রগমা গমপা মপধা পধনা ধনর্সা

র্সনধা নধপা ধপমা পমগা মগরা গরসা।

২. সরগমা রগমপা গমপধা মপধনা পধনর্সা

র্সনধপা নধপমা ধপমগা পমগরা মগরসা।

৩. সরগমপা রগমপধা গমপধনা মপধনর্সা

র্সনধপমা নধপমগা ধপমগরা পমগরসা।

রাগ-বিলাবল : পরিচয়

এই রাগ বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ জাতি। ধা বাদী ও গা সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা প্রথম প্রহর। প্রকৃতি শান্ত। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।

আরোহ : সা রা গা মা পা ধা না র্সা

অবরোহ : র্সা না ধা পা মা গা রা সা।

পকড় : গা মা রা, গা পা, ধা না র্সা।

রাগ-কল্যাণ ঃ পরিচয়

এই রাগ কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে তীব্র মধ্যম (হ্মা) ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। গা বাদী না সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। প্রকৃতি শান্ত। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।

আরোহ ঃ সা রা গা হ্মা পা ধা না র্সা

অবরোহ ঃ র্সা না ধা পা হ্মা গা রা সা।

পকড় ঃ ন্‌া রা গা রা-সা, পা হ্মা গা, রা সা।

রাগ-ভৈরব ঃ পরিচয়

এই রাগ ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত। ইহা ভৈরব ঠাটের আশ্রয়রাগ। ইহাতে ঋা দা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। দা বাদী ও ঋা সমবাদী। গাহিবার সময় ভোর। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। প্রাতঃকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

আরোহ ঃ সা ঋা গা মা পা দা না র্সা

অবরোহ ঃ র্সা না দা পা মা গা ঋা সা।

পকড় ঃ সা গা মা পা দা পা।

পর্যায় ঃ পূজা

১.	এই কথাটা ধরে রাখিস	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪৪
২.	এক হাতে ওর কৃপাণ আছে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪৪
৩.	তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৩৮
৪.	কবে আমি বাহির হলেম	তাল তেওরা	স্বরবিতান ৩৭
৫.	এই লভিনু সঙ্গ তব	তাল ঝম্পক	স্বরবিতান ৪০

পর্যায় ঃ প্রেম

১.	গানের ডালি ভরে দেলো	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫
২.	আয় তবে সহচরি	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ২০
৩.	হে ক্ষণিকের অতিথি	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৩১
৪.	তুমি আমায় ডেকেছিলে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩
৫.	এবার উজাড় ক'রে	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ২

পর্যায় ঃ প্রকৃতি

১.	বাদল ধারা হল সারা	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৫
২.	শ্যামল শোভন শ্রাবণ তুমি	তাল দাদরা	স্ববিতান ৩১
৩.	পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩০
৪.	আজি বারি ঝরে ঝর ঝর	তাল তেওরা	স্বরবিতান ১১
৫.	ওরা অকারণে চঞ্চল	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫

পর্যায় ঃ স্বদেশ

১.	আমরা সবাই রাজা	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪২
২.	এখন আর দেরী নয়	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪৬
৩.	সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৭

পর্যায় ঃ আনুষ্ঠানিক

১.	হে নূতন—দেখা দিক আর বার	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫৫
২.	সবারে করি আহ্বান	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫৫
৩.	মরুবিজয়ের কেতন উড়াও	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩১

পর্যায় ঃ বিচিত্র

১.	সব কাজে হাত লাগাই মোরা	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৫২
২.	আধেক ঘুমে নয়ন চুমে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৫
৩.	ওই ঝঙ্কার ঝঙ্কারে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪২

তাল-দাদরা : ৬ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´
I ধা ধি না । ধা তি না I

পরিচয়

এই তালেব ছয়টি মাত্রা। দুইটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে তিনটি করিয়া মাত্রা আছে। একটি তাল ও একটি ফাঁক।

দাদরা-তালের দ্বিগুণ

১´
I ধাধি নাধা তিনা । ধাধি নাধা তিনা I

তাল-কাহারবা : ৮ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´
I ধা গে না তি । না গে ধি না I

পরিচয়

এই তালের ৮টি মাত্রা। দুইটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া মাত্রা আছে। একটি তাল ও একটি ফাঁক।

কাহারবা-তালের দ্বিগুণ

১´
I ধাগে নাতি নাগে ধিনা । ধাগে নাতি নাগে ধিনা I

তাল-তীব্রা বা তেওরা : ৭ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´ ২ ৩

তবলার ঠেকা : I ধি ধি না । ধি না । ধি না I

১´ ২ ৩

পাখোয়াজের ঠেকা : I ধা দীন তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে I

পরিচয়

এই তালের ৭টি মাত্রা। তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে তিনটি ও দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগে দুইটি করিয়া মাত্রা আছে। ইহাতে তিনটিই তাল। কোন ফাঁক নাই।

তেওরা-তালের দ্বিগুণ

১´ ২ ৩

I ধিধি নাধি নাধি । নাধি ধিনা । ধিনা ধিনা I

তাল-ঝম্পক : ৫ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´ ২

I ধি ধি না । ধি না I

পরিচয়

এই তালটি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত। এই তালের ৫টি মাত্রা। দুইটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে তিনটি ও দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি মাত্রা আছে। ইহাতে দুইটিই তাল। কোন ফাঁক নাই।

ঝম্পক-তালের দ্বিগুণ

১´ ২

I ধিধি নাধি নাধি । ধিনা ধিনা I

॥ সাঙ্গীতিক পরিভাষা ॥

সঙ্গীত

প্রাণী মাত্রেরই চিত্তকে প্রসন্ন করিতে সমর্থ হয় স্বর-সমূহের এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাকে **সঙ্গীত** বলা হয়। প্রাচীন গ্রন্থে বলা হইয়াছে **"গীতং, বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে"**, অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি কলার সমাবেশেই সঙ্গীত। সুর, অর্থযুক্ত শব্দ ও তালের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে **গীত** বলা হয়। সুর ও তাল সহযোগে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে **বাদ্য** বলা হয় এবং তাল ও বিভিন্ন সুললিত ছন্দ সহযোগে মনোমুগ্ধকর সুন্দর অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে **নৃত্য** বলা হয় সঙ্গীত শব্দটিতে তিনটি কলার সমাবেশ হইয়াছে। গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটিই স্বতন্ত্র জিনিষ; অতএব সঙ্গীত শাস্ত্রকে **গীতাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায়** ও **নৃত্যাধ্যায়** এই তিনটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সঙ্গীত, ধনী-দরিদ্র ও পণ্ডিত-মূর্খ নির্বিশেষে রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের কুটীর সর্বত্রই সমভাবে সম্মানিত ও সমাদৃত হয়। এককথায় সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কোন প্রশংসাই অকিঞ্চিৎকর।

সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদকে এইরূপ বলিয়াছেন,

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ আমি বৈকুণ্ঠে কিংবা যোগীদের হৃদয়ে অবস্থান করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন, আমি সেই স্থানেই বিরাজ করিয়া থাকি।

সঙ্গীত সম্বন্ধে মহাকবি সেক্‌সপীয়র তাঁহার **"মার্চেন্ট অব ভেনিস"** নাটকে [৫ম অঙ্ক ১ দৃশ্য] এইরূপ বলিয়াছেন—

The man that hath no music in himself
Nor is not moved with concord of sweet sounds
Is fit for treasons, stratagems and spoils
The motions of his spirit are dull as night
And his affections dark as Erebus

যে মানুষের সঙ্গীতে রুচি নাই, সঙ্গীতের বিশ্ববিমোহিনী স্বর যাহাকে মুগ্ধ করে না, সে বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী, পরস্বাপহারক। অমাবস্যা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকার অপেক্ষা তাহার হৃদয় অধিকতর ভয়ঙ্কর।

ভারতবর্ষে প্রচলিত মুখ্য সঙ্গীত পদ্ধতি

ভারতবর্ষে দুইপ্রকার সঙ্গীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে যথা:—**উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি ও দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটী পদ্ধতি।**

উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি ঃ

বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে সমগ্র উত্তরভারতে অর্থাৎ আর্যাবর্তে যে সঙ্গীত প্রথা প্রচলিত আছে তাহাকে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটী পদ্ধতি ঃ

বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে সমগ্র মাদ্রাজ, অন্ধ্র, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে যে সঙ্গীত প্রথা প্রচলিত আছে তাহাকে দক্ষিণভারতীয় বা কর্ণাটী পদ্ধতি বলা হয়।

ধ্বনি

সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে ধ্বনি হইতে এবং ধ্বনির উৎপত্তি হইয়াছে দুইটি জিনিষের পরস্পর সংঘর্ষ হইতে। বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ ওঠে সেই তরঙ্গ কম্পন আমাদের কর্ণপটে আসিয়া আঘাত করিলে আমরা যাহা শুনিতে পাই তাহাকেই ধ্বনি বলা হয়। ধ্বনি দুই প্রকার যথা—মধুর ধ্বনি ও কর্কশ ধ্বনি। মধুর ধ্বনি আমাদের শুনিতে ভাল লাগে ইহাতে মন প্রসন্ন হয়, আর কর্কশ ধ্বনি আমাদের শুনিতে ভাল লাগে না, ইহাতে মন অপ্রসন্ন হয়। ইহাকে কোলাহল বলা হয়।

নাদ

নাদ অর্থে শব্দ। নাদ সূক্ষ্মতম শব্দ বা শব্দের কম্পন। নিয়মিত ও স্থির আন্দোলন হইতে উৎপন্ন মধুর ধ্বনিকে **নাদ** বলা হয়। যে ধ্বনি অনিয়মিত ও অমধুর তাহা সঙ্গীতের উপযোগী নহে। নাদ আহত ও অনাহত ভেদে দুই প্রকার যথা :—**আহত নাদ** ও **অনাহত নাদ**। আহত নাদ বক্ষ, কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া কণ্ঠে শব্দরূপে প্রকাশ পায়। সঙ্গীতে এই নাদ ও শ্রুতি ষড়জাদি স্বররূপে অভিব্যক্ত। ব্যক্ত নাদ দুই প্রকার যথা—**বর্ণাত্মক** ও **ধ্বন্যাত্মক**। মানুষের কণ্ঠে যে নাদ ধ্বনিত হয় তাহাকে বর্ণাত্মক নাদ বলে। কোন বস্তুতে কোন বস্তু দিয়া আঘাত করিলে যে নাদ উৎপন্ন হয় তাহাকে ধ্বন্যাত্মক নাদ বলে, যেমন তবলা ইত্যাদির শব্দ বা ধ্বনি। অনাহত নাদ বিনা আঘাতেই উৎপন্ন হয় ও সাধারণতঃ শোনা যায় না। ইহাকে সূক্ষ্ম, গুপ্ত বা অব্যক্ত নাদ বলা হয়। সিদ্ধব্যক্তি এই নাদের সাধনা করিয়া মোক্ষলাভ করেন। এই নাদ স্বয়ং উৎপন্ন হয়। নাদ সম্পর্কে নারদ সংহিতায় বলা হইয়াছে—আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে। তত্রানাহত নাদস্তু মুনয়ঃ সমুপাসতে।

শ্রুতি

শ্রূয়তে ইতি শ্রুতি। অসংখ্য নাদ হইতে যে নাদগুলি পরস্পরের পার্থক্যসহ স্পষ্ট শোনা যায় সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহাদের নাম **শ্রুতি**। একটি স্বর সপ্তককে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিলে বাইশটি সূক্ষ্ম স্বর পাওয়া যায়। শ্রুতিগুলি পর পর সাজাইলে দেখা যায়, একটি অপেক্ষা অপরটি সামান্য পরিমাণে উচ্চ। অতএব স্বরের সূক্ষ্মতর বিভাগের নাম শ্রুতি, আর এই শ্রুতিগুলির উপরেই আমাদের প্রচলিত সপ্তস্বর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতির সংখ্যা মোট বাইশটি। বাইশটি শ্রুতির নাম যথা : **তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা, রৌদ্রী, ক্রোধী, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি**

রক্তা, সন্দীপিনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ক্ষোভিনী।

সঙ্গীত শাস্ত্রে শ্রুতির বিভাজন সম্পর্কে বলা হইয়াছে—

চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্‌জমধ্যম পঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ তিস্ত্রী ঋষভ ধৈবতৌ॥

অর্থাৎ ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম চার চার শ্রুতি, গান্ধার ও নিষাদ দুই দুই শ্রুতি, এবং ঋষভ ও ধৈবত তিন তিন শ্রুতি।

দামোদর মিশ্র তাঁহার "সঙ্গীতদর্পণ" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পরিকীর্তিতঃ।

স্বর বলিতে সঙ্গীতের রাগরূপ ও তাহার আনুসঙ্গিক অলঙ্কারকে প্রকাশ করার উপযোগী শব্দ বুঝায়। শ্রবণ যোগ্য সুমধুর যে ধ্বনি তাহাকেই সঙ্গীতোপযোগী নাদ অথবা **স্বর** বলা হয়। স্বরই সঙ্গীতের মুখ্য বা প্রধান অঙ্গ। রাগরাগিণী যুক্ত যে সঙ্গীত, তাহা স্বরেরই বিশিষ্ট রচনা মাত্র। স্বর সঙ্গীতের রঞ্জকতা বৃদ্ধি করে। কোন কিছু অঙ্কন করিতে হইলে যেমন বিনা রঙে সুন্দর হয় না, তেমনি বিনা স্বরে সঙ্গীত হয় না। সঙ্গীতকে স্বরলিপি আকারে প্রকাশ করিতে হইলে যথাস্থানে স্বরের প্রয়োগ ঠিকমত না করিলে রাগের মর্যাদাহানি হয়। সঙ্গীত পরিবেশনকালে স্বরের প্রতি গায়কের বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। কেবল স্বরেরই মাধ্যমে স্বরগম্‌গীত যাহার এক নাম স্বরমালিকা তাহা রচনা করা হয়। ঠুংরী গান যে রাগে গাওয়া হয় তাহাকে সরস এবং বিশেষ রুচিকর করিবার জন্য বিভিন্ন স্বর প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ এই গানের ভাবের মহত্ত্ব কেবল স্বরেরই দ্বারা প্রস্ফুটিত হয়; সুতরাং স্বরই সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ।

স্বর দুই প্রকার, যথা: **শুদ্ধ** অথবা **প্রাকৃত স্বর** ও **বিকৃত স্বর**। প্রাকৃত বা শুদ্ধ স্বরের দুইটি রূপ আছে যেমন: **চল স্বর** ও **অচল স্বর**। আবার বিকৃত স্বরের দুইটি রূপ আছে, যেমন: **কোমল** ও **তীব্র**। প্রাকৃত স্বরগুলির মধ্যে সা ও পা কখনও বিকৃত হয় না, সেই কারণে এই দুইটি স্বরকে **অচল স্বর** বলা হয়। সা ও পা বাদ দিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি স্বরকে **চল স্বর** বলা হয়, কারণ এই স্বরগুলি বিকৃত হয়। বিকৃত পাঁচটি স্বরের আবার দুইটি রূপ আছে, যথা **কোমল** ও **তীব্র**। "ঋা জ্ঞা দা ণা" এই চারিটি স্বরকে বলা হয় কোমল ও "হ্মা" এই স্ববটিকে বলা হয় তীব্র বা কড়ি। অতএব দেখা যাইতেছে, সাতটি প্রাকৃত স্বর হইতে পাঁচটি বিকৃত স্ববের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত স্বব মিলিয়া মোট বারটি স্বর ব্যবহৃত হয়। সাতটি শুদ্ধ স্বব যথা:—**ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত** ও **নিষাদ**। এই স্বরগুলিকে সংক্ষেপে সা রা গা মা পা ধা না উচ্চারণ করা হয়। পাঁচটি বিকৃত স্বব যথা:—**কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার, তীব্র মধ্যম, কোমল ধৈবত** ও **কোমল নিষাদ**। এই স্বরগুলি সংক্ষেপে হইল ঋা জ্ঞা হ্মা দা ণা। অতএব শুদ্ধ ও বিকৃত মিলিয়া **সপ্তকে মোট বারটি স্বর আছে**। যথা: সা ঋা রা জ্ঞা গা মা হ্মা পা দা ধা ণা না।

সপ্তক

'সা' হইতে 'না' পর্যন্ত সাতটি শুদ্ধ স্বর ক্রমানুসারে লিখিত ও সঙ্গীতে ব্যবহার হইলে তাহাকে **সপ্তক** বলা হয়। সপ্তক তিন ভাগে বিভক্ত যথা:—**মন্দ্র বা উদারা সপ্তক, মধ্য বা মুদারা সপ্তক** ও **তার বা উচ্চ সপ্তক**। প্রথম সপ্তককে মন্দ্র সপ্তক, দ্বিতীয় সপ্তককে মধ্য সপ্তক ও তৃতীয় সপ্তককে তার সপ্তক বলা হয়। মন্দ্র বা উদারা সপ্তকের স্বরের উচ্চারণে হৃদয়ে, মধ্য বা মুদারা সপ্তকের স্বরের উচ্চারণে কণ্ঠে ও তার বা উচ্চ সপ্তকের স্বরের উচ্চারণে তালুতে বিশেষ জোর লাগে। মন্দ্র সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্য সপ্তকের

স্বরের আওয়াজ অপেক্ষা দ্বিগুণ নীচে, মধ্য সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মন্দ্র সপ্তকের স্বরের আওয়াজ অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চে ও তার সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্য সপ্তকের স্বরের আওয়াজ অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চে হইয়া থাকে। মন্দ্র সপ্তকেব স্বরের সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরের নীচে হসন্ত দিয়া বোঝান হয় যেমন ঃ প্‌া ধ্‌া ন্‌া। মধ্য সপ্তকের স্বরের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহাব করা হয় না, যেমন ঃ গা মা পা। তার সপ্তকের স্বরের সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরের মাথায় রেফ দিয়া বোঝান হয় যেমন ঃ র্গা র্মা র্পা।

ঠাট

ঠাট অর্থে কাঠামো। রাগ উৎপাদনে সমর্থ বিশিষ্ট স্বর রচনাকে **ঠাট** বলা হয়। নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বব এবং স্বর হইতে ঠাট। সপ্তকের অন্তর্গত শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর মিলিয়া মোট বারটি স্বর থাকে। এই বারটি স্বর হইতে বিভিন্ন ঠাটের উৎপত্তি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী তাঁর **"চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা"** গ্রন্থে প্রথম হিসাব করিয়া দেখাইলেন যে, দ্বাদশ স্বর হইতে ৭২টির বেশী ঠাট বচনা করা সম্ভব নয়। ইহার পর উত্তরভারতের স্বনামধন্য মঞ্জরীকার (পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী) ৭২টি ঠাট হইতে দশটি ঠাট বাছিয়া লইয়া উত্তরভারতীয় সঙ্গীতের রাগগুলিকে দশঠাটের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। এই দশটি ঠাটের নাম হইল :—[১] **কল্যাণ** [২] **বিলাবল** [৩] **খাম্বাজ** [৪] **ভৈরব** [৫] **পূর্বী** [৬] **মারবা** [৭] **কাফী** [৮] **আসাবরী** [৯] **ভৈরবী** [১০) **টোড়ী**। সাতটি স্বরের নীচে ঠাট রচিত হয় না। ঠাটের স্বরগুলি ক্রমানুসারে সাজাইতে হয়, যেমন—সা রা গা মা পা ধা না। ঠাটে কেবল আরোহ আছে, অবরোহ নাই। ঠাটের মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতা নাই। ঠাটে কোন স্বর বর্জিত হয় না। প্রত্যেক ঠাটেই এমন একটি করিয়া রাগ আছে যাহা ঠাটের নামে পরিচিত। যেমন 'ভৈরব রাগ' ভৈরব ঠাটের নামে পরিচিত।

সপ্তকের অন্তর্গত বারটি স্বর হইতে ১০টি ঠাটের রচনা কিভাবে করা হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১. **কল্যাণ :** এই ঠাটে কেবল তীব্র মধ্যম ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা রা গা হ্মা পা ধা না ॥

২. **বিলাবল :** এই ঠাটে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়—
যথা :—সা রা গা মা পা ধা না ॥

৩. **খাম্বাজ :** এই ঠাটে কেবল কোমল ণা ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা রা গা মা পা ধা ণা ॥

৪. **ভৈরব :** এই ঠাটে ঋা ও দা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা ঋা গা মা পা দা না ॥

৫. **পূর্বী :** এই ঠাটে ঋা দা কোমল, হ্মা তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা ঋা গা হ্মা পা দা না ॥

৬. **মারবা :** এই ঠাটে ঋা কোমল, হ্মা তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা ঋা গা হ্মা পা ধা না ॥

৭. **কাফী :** এই ঠাটে জ্ঞা ও ণা কোমল, বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা ॥

৮. **আসাবরী :** এই ঠাটে জ্ঞা দা ণা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা রা জ্ঞা মা পা দা ণা ॥

৯. **ভৈরবী :** এই ঠাটে ঋা জ্ঞা দা ণা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা ঋা জ্ঞা মা পা দা ণা ॥

১০. **টোড়ী :** এই ঠাটে ঋা জ্ঞা দা কোমল, হ্মা তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর—
যথা :—সা ঋা জ্ঞা হ্মা পা দা না ॥

অলঙ্কার বা পাল্টা

নিয়মিত বর্ণ সমুদয়কে **অলঙ্কার** বা **পাল্টা** বলা হয়। আরোহে যে নিয়মে স্বর রচনা করা হইবে, অবরোহে ঠিক একই নিয়মে স্বর রচনা করিতে হইবে।

যেমন : সরগা রগমা গমপা মপধা পধনা ধনর্সা
র্সনধা নধপা ধপমা পমগা মগরা গরসা।

বর্ণ

সঙ্গীত শাস্ত্রকার মতঙ্গ তাঁহার "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

বর্ণশব্দেন গানমভিধীয়তে। বর্ণাশ্চত্তার এব হি—
স্থায়িসঞ্চারিণৌ চৈব তথারোহ্যবরোহিণৌ ॥

গানের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে **বর্ণ** বলা হয়। বর্ণ চারি প্রকার যথা :—**স্থায়ী বর্ণ, আরোহী বর্ণ, অবরোহী বর্ণ** ও **সঞ্চারী বর্ণ**।

স্থায়ী বর্ণ :—একই স্বর পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিলে তাহাকে **স্থায়ী বর্ণ** বলা হয়। যেমন :—সা-সা-সা রা-রা-রা ইত্যাদি। শাস্ত্রকার দত্তিলের মতে —এক স্বরা পদে গীতিঃ স্থায়িবর্ণঃ অভিধীয়তে।

আরোহী বর্ণ :—নিম্ন হইতে উর্ধ দিকে স্বর প্রয়োগ করিলে তাহাকে **আরোহী বর্ণ** বলা হয়। যেমন : সরগমা রগমপা। মতঙ্গ বলেন—যত্র গেয়াঃ স্বরা আরোহন্তি একৈকশঃ সান্তরা বা সবর্ণ আরোহীত্যুচ্যতে।

অবরোহী বর্ণ :—উর্ধ হইতে নিম্ন দিকে স্বর প্রয়োগ করিলে তাহাকে **অবরোহী বর্ণ** বলা হয়। যেমন :—র্সনধপা, নধপমা।

সঞ্চারী বর্ণ :—স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী বর্ণের সংমিশ্রণকে **সঞ্চারী বর্ণ** বলা হয়। যথা :—সরগমা পমগরা, সরগগা রগরসা ইত্যাদি।

মাত্রা

মাত্রা হইল লয় মাপিবার মাপকাঠি। তাল মাপিবার একক সংখ্যাকে মাত্রা বলা হয়, অর্থাৎ সমান গতির এক একটি শব্দকে মাত্রা কহে। এইরূপ কয়েকটি মাত্রার সমষ্টি দ্বারা এক একটি তাল গঠিত হয়।

তাল

ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি নির্দিষ্ট মাত্রার সমষ্টিকে **তাল** বলা হয়। সঙ্গীতকে বিভিন্ন প্রকার সুললিত ছন্দে বদ্ধ করিয়া মনোমুগ্ধকর করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, একতাল, চৌতাল প্রভৃতি বিভিন্ন তালের সৃষ্টি হইয়াছে। তাল দুই প্রকাব যথা :—**সমপদী তাল** ও **বিষমপদী তাল**।

সমপদী তাল :—সমান সমান মাত্রায় বিভক্ত তালকে সমমাত্রিক বা সমপদী তাল কহে। যেমন—ত্রিতাল, কাহাববা ইত্যাদি।

বিষমপদী তাল :— যে তালেব প্রতি বিভাগে সমান সংখ্যক মাত্রা থাকে না তাহাকে বিষমপদী তাল কহে। যেমন—ঝাঁপতাল, তীব্রা, ধামার ইত্যাদি।

সম্

তালের প্রথম মাত্রাকে সম্ বা প্রথম তাল বলা হয় অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট মাত্রা হইতে তাল প্রথম আরম্ভ করা হয় তাহাকেই **সম্** কহে। গান যে কোন মাত্রা হতেই আরম্ভ করিয়া এই সমে আসিয়া শেষ করিতে হয় ও তাল সম্ হইতে আরম্ভ কবিয়া আবার সমে আসিয়া শেষ করিতে হয়। তাললিপিতে তালের প্রথম মাত্রার উপবে বা নীচে '+' বা '×'এইরূপ চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়।

তালি ও খালি

তালি :—তাল বিভাগ দেখাইবার সময় দুই হাতের তালু দ্বারা যে বিভাগগুলিকে তালি দেওয়া হয় তাহাকে তালি বলা হয় তাললিপিতে তালির চিহ্ন "২ ৩ ৪" প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা বোঝান হয়।

খালি :—তাল বিভাগ দেখাইবার সময় যে বিভাগগুলিতে তালি দেওয়া হয় না অর্থাৎ বিরতি বোধক অনাঘাত থাকে তাহাকে খালি বলা হয়। তাললিপিতে খালির চিহ্ন এইরূপ "O" শূন্য দ্বারা বোঝান হয়।

ঠেকা

তবলার ভাষাকে ঠেকা বলা হয় অর্থাৎ যে বোল বা বর্ণের সাহায্যে তবলায়

বিভিন্ন তাল বাজান হয় তাহাকেই **ঠেকা** কহে। যেমন দাদরা তালের ঠেকা
I ধা ধি না । ধা তি না I

আরোহ ও অবরোহ

আরোহ ঃ—যখন কোন স্বরসমষ্টি আরোহণক্রমে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিতে থাকে, তখন তাহাকে আরোহণ বা **আরোহ** বলা হয়। যেমন :—

সা রা গা মা পা ধা না র্সা।

অবরোহ ঃ—যখন কোন স্বরসমষ্টি অবরোহণক্রমে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে থাকে তখন তাহাকে অবরোহণ বা **অবরোহ** বলা হয়। যেমন :—

র্সা না ধা পা মা গা রা সা।

পকড়

রাগবাচক মুখ্য স্বরসমুদয়কে পকড বলা হয় অর্থাৎ যে অল্পসংখ্যক স্বরসমষ্টি দ্বারা রাগ চিনিতে পারা যায় তাহাকেই **পকড়** কহে। যেমন ইমন রাগের পকড় : ন্া রা গা রা সা, পা হ্মা গা, রা সা।

মীড়

এক স্বর হইতে অপর স্বরে গডাইয়া যাওয়াকে **মীড়** বলা হয় অর্থাৎ যাহার ধ্বনি খণ্ডিত নহে। সঙ্গীতে এই মীড অপরিহার্য। গানের স্বরলিপিতে মীড়ের এই ক্রিয়াকে অর্ধবৃত্তাকার রেখা দ্বারা বোঝান হয়। ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে স্বরের মাথায় ও আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে স্বরের নীচে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যেমন—ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে—সা ম ও আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে সা মা।

দুণ

দুই মাত্রাকে এক মাত্রার মধ্যে গাওয়া বা বাজান হইলে তাহাকে দুণ কহে অর্থাৎ ঠায় বা বরাবর লয়ের দুইগুণ গতিকে **দুণ** বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন: 'আমাদের পরিবারে গানচর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অঙ্গই একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমায় সেই অতুল প্রেম-আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের দাদাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই হিন্দী গানের বিশেষ চর্চা করিয়াছেন। গুরুদেব লিখিয়াছেন—

"বড়দাদা-সেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন। ছেলেমানুষ বলিয়া আমাদের তথার প্রবেশের অধিকার ছিল না।" বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঁশি ও অর্গান বাজনায় নিপুণ ছিলেন। ইহা ছাড়া আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রথম সূত্রপাত ইনি করেন ১২৭৬ সালে। হেমেন্দ্রনাথ তানপুরা-কাঁধে কিরকম ধৈর্যের সহিত হিন্দি গান অভ্যাস করিতেন তাহা বর্ণনা করিয়া গুরুদেব বলিয়াছেন—

"সেজদাদা শিখতেন বটে, তিনি স্বর ভাঁজছেন তো ভাঁজছেনই, গলা সাধছেন তো সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী-গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সন্ধ্যাবেলায় উৎসবে আমোদে উপাসনা-মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাংলা ভাষায়।" বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক

ও গুরুদেবের পরিবারের সঙ্গীত শিক্ষক। এই বিষ্ণুই ছিলেন গুরুদেবের সঙ্গীত জীবনে প্রথম গুরু, ইঁহারই নিকট গুরুদেবের ভারতীয় সঙ্গীতে প্রথম হাতে-খড়ি হয়।

গুরুদেবের শিশু বয়সে যাঁহারা বিশেষভাবে তাঁহার মনের মধ্যে সঙ্গীতের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গায়ক বিষ্ণুর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পর শ্রীকণ্ঠ সিংহ, এক অজানা গায়ক ও যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই ছিলেন হিন্দিগানের বিশেষ রসিক। গুরুদেব বলিয়াছেন—

"আমাদের বাড়ীর বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। তিনি তো গান শেখাতেন না ; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করত, গান ধরতেন—'ময়্ ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী'—সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।" ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন···'

এই (শ্রীকণ্ঠ সিংহ) অজানা গায়ককে স্মরণ করিয়া গুরুদেব লিখিয়াছেন—''ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নাই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকালবেলার সুরে চলত, 'বঙ্‌শি হমারি রে'।"

যদুভট্টের প্রতি গুরুদেবের শ্রদ্ধাও ছিল গভীর। স্রষ্টা হিসাবে তাঁহার প্রতিভায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এই ওস্তাদের সম্বন্ধে গুরুদেব লিখিয়াছেন—"ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ-মর্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মত তাল-ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনিই

বিখ্যাত যদুভট্ট। যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ। বাঙলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"

মাতৃদেবীর মৃত্যুর পর স্কুলে যাওয়া ছাড়িয়া দিলেন রবীন্দ্রনাথ; সে সময়ে 'সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবের চর্চায়, বাল্যকাল হইতে' যিনি কবির 'প্রধান সহায়' ছিলেন সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও তাঁহার পত্নীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ছেলেবেলায় লিখিতেছেন: 'ছাদের ঘরে এল পিয়ানো।...এইবার ছুটল আমার গানের ফোয়ারা।...বউঠাকরুন গা ধুয়ে, চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাৎলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধবতুম চড়া স্বরের গান। গলায় যেটুকু স্বর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনো তা ফিরিয়ে নেননি। সূর্য-ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান।' এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—হ্যাঁ গান হত ও বাড়িতে, তেতলার ছাদে নতুন কাকিমার ঘরে। একদিকে জ্যোতিকাকামশায় পিয়ানো বাজাচ্ছেন, আর একদিকে রবিকা গাইছেন। সেই অল্প বয়সের রবিকার গলা, সে যেমন স্বর তেমনি গান। মাত করে দিতেন চারিদিক। এ-বাড়ী থেকে শুনতুম আমি কান পেতে।'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাহার পুত্রদের সঙ্গীত শিক্ষার যথাযথ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রেরণায় ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ, পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং কন্যা সৌদামিনী দেবী বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পিতার উৎসাহ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন: "একবার মাঘোৎসবে [মাঘ ১২৯৩] সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম।

তাহার মধ্যে একটি গান 'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।' পিতা তখন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেখানে আমার এবং জ্যোতিদাদার ডাক পড়িল। হারমোনিয়মে জ্যোতিদাদাকে বসাইয়া আমাকে তিনি নূতন গান সবকটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোন কোন গান দুবারও গাহিতে হইল।...তিনি বলিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে তো তাহারা পুরস্কার দিত। রাজার দিক হইতে যখন তাহার কোন সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে।' এই বলিয়া তিনি একখানি পাঁচ-শ টাকার চেক আমার হাতে দিলেন।'...গান গাহিয়া এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার লাভ করিলেন। মহর্ষিদেব রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান বিশেষভাবে পছন্দ করিতেন। সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি' রচনায় দেখা যায়: 'সঙ্গীত বিশেষরূপ ভালো না হইলে তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] শুনিতে ভালোবাসিতেন না। প্রতিভার পিয়ানো বাজানো এবং রবির গান তিনি শুনিতে ভালোবাসিতেন। বলিতেন, রবি আমাদের বাংলাদেশের বুলবুল।'

বস্তুতঃ আপন পরিবারের মধ্যেই সঙ্গীতের যে পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে শিশুকালেই পুষ্ট করিয়াছিল, তাহারই প্রভাব তাঁহার সমগ্র জীবনে সুচিরস্থায়ী হইযাছিল। তাঁহার অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা সঙ্গীতের উদার জগতে পরিপূর্ণ বিকাশলাভ হইয়া গানের জগতে বাঙালীর স্বর সাধনাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সহজেই গানের রাজা হইয়া উঠিয়াছেন।

ঠাকুর পরিবারে সঙ্গীতের চর্চা

প্রকৃতপক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় হইতেই ঠাকুর পরিবারে সাংস্কৃতিক জয়যাত্রার সূচনা হইলেও দ্বারকানাথের পূর্ব হইতে ঠাকুর পরিবারে কালোয়াতী গানের চর্চা ও কদর ছিল। দ্বারকানাথের পিতৃব্য রামলোচন ঠাকুর সে যুগের বিখ্যাত কালোয়াতগণকে আহ্বান করিয়া নিজের বাড়ীতে মজলিস্ বসাইতেন। এই মজলিসে আত্মীয় স্বজনেরাও নিমন্ত্রিত হইতেন।

দ্বারকানাথের উদ্যানবাটি 'বেলগাছিয়া ভিলা'তে নিয়মিত নৃত্য ও গীতেব আসর বসিত। ইউরোপীয় সংগীতের তিনি একজন ভক্ত ছিলেন। দ্বারকানাথ সম্পর্কে ম্যাক্সমুলাব সাহেব একটি পত্রে বলিয়াছেনঃ "তিনি অত্যন্ত সংগীতপ্রিয ছিলেন এবং ইতালীয় ও ফরাসী সংগীত খুব পছন্দ করিতেন। তিনি গান করিতেন এবং আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাইতাম। এইভাবে আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিয়া যাইত। তিনি বেশ সুকণ্ঠ ছিলেন।" দ্বারকানাথের এই সংগীতপ্রীতি উত্তরকালে তাঁহার পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং সংগীতে এক নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময় হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারেব গৌরব ও সমৃদ্ধি আবো সুবিস্তৃত হয়। ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত রচনায় দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনেব দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের সংগীতের দ্বারা প্রভাবিত হন। ব্রহ্মসংগীত রচনার উদ্বোধন করেন রামমোহন, পরে দেবেন্দ্রনাথ নিজে সংগীত রচনায় উদ্যোগী হন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রদেরও নানাভাবে উৎসাহিত করেন। কালক্রমে মহর্ষির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাডী সংগীত জগতের এক তীর্থস্থানে পরিণত হয়। মহর্ষি নিজে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অনুশীলন করিলেও তিনি বাংলার বাউল, কীর্তন, কবিগান প্রভৃতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রীতির জন্য ঠাকুর পরিবারে অনেক বিখ্যাত গায়কের স্থান হইয়াছিল এবং ইঁহাদের মধ্যে যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার এই সকল শিল্পীরা ছাড়া বরোদার বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুকাল ঠাকুর বাড়িতে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ নামে আর একজন গায়ক ছিলেন যাঁহার প্রভাব ঠাকুর পরিবার যথেষ্ট ছিল। ইনি ছিলেন মহর্ষির বন্ধু।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পুত্রদের সংগীত শিক্ষার যথাযত সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রেরণায় ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ পুত্র

দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ এবং কন্যা সৌদামিনী দেবী বহু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। সংগীতের ক্ষেত্রে পিতার উৎসাহ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেরই সংগীতে যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথমেই এক স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন এবং পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটু সংস্কার করিয়া যে স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন করেন তাহাই বর্তমানকালের আকারমাত্রিক স্ববলিপি নামে পরিচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ অর্গান ও বাঁশি বাজনায় দক্ষ ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কণ্ঠসংগীত ছাড়া বোম্বাইয়ের এক মুসলমান সেতারীর নিকট সেতারও শিখিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেনঃ "সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দম উৎসাহে দৌড করাইয়াছিলেন, তাহাব সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা। · সকল পুরানো কায়দায় ভিডের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নিজলা নূতন মন নিয়ে। সাহিত্যের শিক্ষায়, ভাবেব চচায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন স্বর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলীনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।" ঠাকুর পরিবারে আর একজন দক্ষ সেতারী ছিলেন, ইনি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। হেমেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তিনি নিজ পত্নীকে সংগীত শিক্ষায় উৎসাহিত করেন এবং কন্যা প্রতিভাদেবী কালক্রমে পিতার উৎসাহে সংগীতে পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও গান-বাজনা জানিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীও গায়িকা হিসাবে ঠাকুর পরিবারে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত চর্চার মধ্যে বড় হইয়াছিলেন। ফলে সংগীত তাঁহার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে সহজে প্রবেশ করিয়াছিল। গতিশীলতাই প্রাণের স্বাভাবিক লক্ষণ। ইহারই মধ্য দিয়াই কোন সজীব ও সংস্কৃতির বিকাশ ও স্ফূর্তি সম্ভব। তাই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে, নূতন নূতন পদ্ধতিতে তিনি প্রাচীন সঙ্গীতের 'জড় পুনরাবর্তনের' মধ্যে নূতন প্রাণের মন্ত্র উচ্চারণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গতানুগতিকতার আগল ভাঙিয়া তিনি এক নব জাগরণের সূচনা করিয়াছেন। সংগীতের নব-রূপায়ন করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ রক্ষণশীল সঙ্গীতশাস্ত্রীগণের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছেন। ভারতীয় রাগকে আশ্রয় করিয়া নূতন ঢংয়ে গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত তখন কোন বড় সঙ্গীতের আসরে গাওয়া চলিত না। কিন্তু রাধিকা গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞগণ সকল সমালোচনাকে উপেক্ষা করিয়া রাগাশ্রয়ী রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রসার ও জনপ্রিয়তার জন্য তাঁহাদের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ পুরাতনকে অস্বীকার করিয়া নূতন কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নয়। বিশ্বের অবিনশ্বর রসস্রোত ও ভাবধারাকে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় রাগগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। তাই এই রাগগুলির আবেদন শাশ্বত—ইহাদের উপেক্ষা করিয়া কোনপ্রকার সাঙ্গীতিক প্রকাশ সম্ভব নয়। ভেঁরো যেন ভোরবেলাকার আকাশের প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রা-বিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গীবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিগন্তের ক্লান্তিনিঃশ্বাস, পূরবী যেন শূন্য-গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।' ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের এ মূল সত্যকে রবীন্দ্রনাথ কখনই অস্বীকার করেন নাই।

বৈজু বাওরা, তানসেন প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্যদের রচিত ধ্রুপদ গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রূপটি ধরা পড়ে ; এই ধ্রুপদী সঙ্গীতই রবীন্দ্র সঙ্গীত-প্রতিভার মূল উৎস। তাঁহাদের গাওয়া শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুর কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গীতপ্রীতি ও সঙ্গীত শিক্ষার মূলে যদুভট্টের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বার বার স্মৃতিতর্পণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা শিখিয়া সঙ্গে সঙ্গে এই সব গানের কাঠামোয় অসংখ্য বাংলা গান রচনা করিয়াছেন। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদ ও বিলম্বিত খেয়াল শিক্ষা করেন। তাই তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি সবই ধ্রুপদ অনুসারী।

পনেরো ষোল বৎসর বয়স হইতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনা শুরু হয় এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাহা অব্যাহত থাকে। এই দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে তিনি প্রায় আড়াই হাজার গান রচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে স্বরারোপ করিয়াছেন। এই সব গান দেশী ও বিদেশী নানা সুরকে অবলম্বন করিয়া তিনি গান রচনা করিলেও তাহা শেষ পর্যন্ত বাংলার নিজস্ব পদ্ধতিতে সাজানো ভারতীয় গান হইয়া উঠিয়াছে।

আবার তালের ক্ষেত্রে দেখা যায় আর এক নূতনত্ব। রবীন্দ্রনাথের গানে কোথাও কোথাও তালের কালোয়াতির সুযোগ থাকিলেও তাল কখনও গানের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। বরং রাগ-সঙ্গীতের বিভিন্ন তালের মূল ছন্দটিকে গানের ভাবের সহিত মিলাইয়া গাহিলেই এ গান সফল। নূতন ছন্দে বাঁধা কয়েকটি তালও সৃষ্টি করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, অর্ধঝাঁপ, নবপঞ্চ বিষমছন্দের তালে বাঁধা গানগুলিকে এক নূতন ছন্দদোলার বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য শ্রোতাকে এক নূতনতর আস্বাদন আনিয়া দেয়। রবীন্দ্রসৃষ্ট এই তালগুলিতে

কর্ণাটকী তালের অনুসরণ করিয়া কোন ফাঁক বা খালি রাখেন নাই, সকল বিভাগেই তাল।

বিচিত্র বিষয় ও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁহার গীতি-রচনা প্রতিভাকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ আধ্যাত্ম-অনুভূতি দ্বারা 'পূজা' পর্যায়ের গানগুলি রচিত হইয়াছে। মানব-মানবীর প্রেমের বিচিত্র উল্লাস ও আত্তিকে আশ্রয় করিয়া তিনি 'প্রেম' পর্যায়ের গানগুলি রচনা করিয়াছেন। ষড়ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিতে যে রূপবৈচিত্র দেখা দেয়, তাহার স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ লইয়া রচিত হইয়াছে, তাঁহার 'প্রকৃতি' পর্যায়ের গানগুলি। জাতির মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় দেশাত্মবোধক গানগুলি রচনা করিয়াছেন সেগুলি 'স্বদেশ' পর্যায়ে স্থান পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া মানুষের জীবনে নানা সুখ দুঃখের আরো যে দিকগুলি আছে তাহার বৈচিত্র লইয়া তাঁহার বিচিত্র পর্যায়ের গানগুলি ভিন্নতর এক রসের উৎস হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের সকল অবস্থার মনের গান। মানুষের মনে এমন কোন অনুভূতি নাই, প্রকৃতিতে এমন রঙ নাই যাহাকে বিষয়বস্তু করিয়া তিনি গান রচনা করেন নাই।

এই সকল গান ছাড়া আছে তিনখানি গীতিনাট্য এবং তিনখানি নৃত্যনাট্য। এই গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি বাংলা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। 'বাল্মীকি প্রতিভা' এই পর্যায়ের প্রথম রচনা– 'বাল্মীকি প্রতিভা' পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, ইহা সঙ্গীতের এক নূতন পরীক্ষা।' 'আইরিশ মেলোডিজ'-এর আদর্শকে ভিত্তি করিয়া দেশী ও বিলাতী সুরের মিশ্রণ এই গানগুলির প্রধান লক্ষণীয় বস্তু। ইহার পর তিনি 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা' রচনা করেন। 'রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা'।

রবীন্দ্রনাথ রচিত নৃত্যনাট্যগুলি হইল—চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা। ইহাতে একটি নাট্যকাহিনীকে গানের সংলাপে মঞ্চে সনৃত্য অভিনয় করা হয়। গীতিনাট্যে যেমন সঙ্গীতই মুখ্য, নৃত্যনাট্যে তেমনই নৃত্যের ভূমিকাই প্রধান। এই নৃত্যনাট্যে প্রযুক্ত গানগুলি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের পরিণত বয়সের এক অভিনব সাঙ্গীতিক পরীক্ষা।

গানে স্বরারোপের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোন বিচার ছিল না। তিনি একদিকে যেমন দেশী বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, সারি প্রভৃতি অসংখ্য সুরে গান রচনা করিয়াছেন, তেমনি বিদেশী সুরে বহু গান রচনা করিয়াছেন। অনেক য়ুরোপীয় সঙ্গীতে গানের সুরের ছন্দের সহিত ভারতীয় রাগের মিশ্রণ ঘটাইয়া নূতন শ্রেণীর গান রচনা করিয়াছেন। 'পুরাণো সেই দিনের কথা' গানটির সুর ও চলন 'স্কচ' সঙ্গীতানুসারী হইলেও ইহার মূলে রহিয়াছে আমাদের ভারতীয় ভূপালী রাগ। হিন্দী গানের সুরে বাংলা কথা বসাইয়া তিনি এক শ্রেণীর রসঘন গান সৃষ্টি করিয়াছেন—যেমন একটি গান—'হৃদয়নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে' এই গানটি এই শ্রেণীর গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান। বিভিন্ন দেশ, অঞ্চল ও ভাষার সুর লইয়া গান রচনা করিলেও গানগুলি সবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। এই বৈশিষ্ট্যের মাঝেই গড়িয়া উঠিয়াছে এক নূতন সঙ্গীতধারা যাহার নাম রবীন্দ্রসঙ্গীত। হিন্দুস্থানী কালোয়াতি গায়ন পদ্ধতির তানকর্তব এবং লয়কারির আধিক্যের অবকাশ রবীন্দ্রসঙ্গীতে নাই। সুরেলা গলায় মীড়ের সূক্ষ্ম কাজে ভাবের গভীরতা প্রকাশ ও মাধুর্য সঞ্চারই রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।

॥ দ্বিতীয় বর্ষ ॥

রাগ-খাম্বাজ ঃ পরিচয়

এই রাগ খাম্বাজ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে কোমল ণা ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহতে শুদ্ধ না ও অবরোহতে কোমল ণা প্রয়োগ হইয়া থাকে। আরোহতে কেবল রা বর্জিত ও অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়। খাড়ব-সম্পূর্ণ জাতি। গা বাদী ও না সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।

আরোহ ঃ সা গা মা পা ধা না র্সা

অবরোহ ঃ র্সা ণা ধা পা মা গা রা সা

পকড় ঃ ণা ধা, মা পা ধা, মা গা।

রাগ-কাফী ঃ পরিচয়

এই রাগ কাফী ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে জ্ঞা, ণা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। পা বাদী ও সা সমবাদী। গাহিবার সময় মধ্যরাত্রি। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।

আরোহ ঃ সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা

অবরোহ ঃ র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা

পকড় ঃ সসা, ররা, জ্ঞজ্ঞা, মমা, পা।

রাগ-আশাবরী ঃ পরিচয়

এই রাগ আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত। ইহা আশাবরী ঠাটের আশ্রয়রাগ। ইহাতে জ্ঞা দা ণা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহতে জ্ঞা ও ণা বর্জিত। অবরোহ সম্পূর্ণ। ঔড়ব—সম্পূর্ণ জাতি। দা বাদী ও জ্ঞা সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি শান্ত।

আরোহ : সা রা মা পা দা র্সা।
অবরোহ : র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা রা সা
পকড : রা মা পা, ণা দা পা।

অলঙ্কার

১. সগা রমা গপা মধা পনা ধর্সা
র্সধা নপা ধমা পগা মরা গসা।
২. সরসরগা রগরগমা গমগমপা মপমপধা পধপধনা ধনধনর্সা।
র্সনর্সনধা নধনধপা ধপধপমা পমপমগা মগমগরা গরগরসা।
৩. সগরসা রমগরা গপমগা মধপমা পনধপা ধর্সনধা
র্সধনর্সা নপধনা ধমপধা পগমপা মরগমা গসরগা।
৪. সরগম,মগরসা রগমপ,পমগরা গমপধ,ধপমগা মপধন,নধপম। পধনর্স,র্সনধপ।
র্সনধপ,পধনর্সা নধপম,মপধনা ধপমগ,গমপধা পমগর,রগমপা মগরস,সরগম।।
৫. সরসগরসা রগরমগরা গমগপমগা মপমধপমা পধপনধপা ধনধর্সনধা
র্সনর্সধনর্সা নধনপধনা ধপধমপধা পমপগমপা মগমরগমা গরগসরগা।

পর্যায় : পূজা

১.	সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৫
২.	ফুল বলে ধন্য আমি	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১
৩.	তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ৩৬
৪.	জানি জানি কোন আদিকাল	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ৩৮
৫	বিপদে মোরে রক্ষা কর	তাল ঝম্পক	স্বরবিতান ২৫
৬.	মহারাজ একি সাজে	তাল ঝাঁপতাল	স্বরবিতান ৩৬
৭.	আমার মাথা নত করে	তাল তেওরা	স্বরবিতান ২৩
৮.	হে মন তাঁরে দেখো	তাল রূপক	স্বরবিতান ২৪

পর্যায় ঃ প্রেম

১.	এই কথাটি মনে রেখো	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৫
২.	ছুটির বাঁশী বাজল	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩
৩.	খোল খোল দ্বার রাখিয়ো না আর	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪২
৪.	তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি	তাল তেওরা	স্বরবিতান ১
৫.	কাঁদালে তুমি মোরে	তাল ঝাঁপতাল	স্বরবিতান ২
৬.	নিদ্রাহারা রাতের এ গান	তাল ষষ্ঠী	স্বরবিতান ১৫
৭.	আহা জাগি পোহালো বিভাবরী	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ৫০

পর্যায় ঃ প্রকৃতি

১.	বহু যুগের ওপার হতে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১৫
২.	পূব হাওয়াতে দেয় দোলা	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১
৩.	আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩১
৪.	শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে	তাল ষষ্ঠী	স্বরবিতান ৩১
৫.	আমার মল্লিকাবনে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৫
৬,	ফাগুনের নবীন আনন্দে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫
৭.	নিবিড় অমা তিমির হতে	তাল ঝম্পক	স্বরবিতান ৫
৮.	শ্রাবণের গগনের গায়	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ৫৩

পর্যায় ঃ স্বদেশ

১.	ও আমার দেশের মাটি	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪৬
২.	মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন	তাল তেওরা	স্বরবিতান ৪৭
৩.	অয়ি ভুবন মনোমোহিনী	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪৭

পর্যায় ঃ আনুষ্ঠানিক

১.	অগ্নিশিখা এসো এসো	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৩০
২.	স্বপন পারের ডাক শুনেছি	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৫৬

পর্যায় ঃ বিচিত্র

১.	চোখ যে ওদের	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪২
২.	গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৯
৩.	যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৬

তাল-ত্রিতাল ঃ ১৬ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

২´ ৩ ০ ১

I ধা ধিন ধিন ধা । ধা ধিন ধিন ধা । না তিন তিন তা । তেটে ধিন ধিন ধা I

পরিচয়

এই তালের ১৬টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া মাত্রা আছে। ইহার তিনটি তাল ও একটি ফাঁক। প্রথম, পঞ্চম, ত্রয়োদশ মাত্রায় তাল ও নবম মাত্রায় ফাঁক। সমপদী তাল।

ত্রিতালের দ্বিগুণ

২´ ৩

I ধাধিন ধিনধা ধাধিন ধিনধা । নাতিন তিনতা তেটেধিন ধিনধা I

০ ১

ধাধিন ধিনধা ধাধিন ধিনধা । নাতিন তিনতা তেটেধিন ধিনধা I

তাল-ঝাঁপতাল ঃ ১০ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

২´ ৩ ০ ১

I ধি না । ধি ধি না । তি না । ধি ধি না I

পরিচয়

এই তালের ১০টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে দুইটি, দ্বিতীয় বিভাগে তিনটি, তৃতীয় বিভাগে দুইটি ও চতুর্থ বিভাগে তিনটি মাত্রা আছে। এই তালের তিনটি তাল ও একটি ফাঁক। প্রথম, তৃতীয়, অষ্টম মাত্রার তাল ও ষষ্ঠ মাত্রাব ফাঁক। বিষমপদী তাল।

ঝাঁপতালের দ্বিগুণ

২´ ৩ ০ ১

I ধিনা ধিধি । নাতি নাধি ধিনা । ধিনা ধিধি । নাতি নাধি ধিনা I

ষষ্ঠী-তাল ঃ ৬ মাত্রা

[মূল ঠেকা * ববাবর লয]

১´ ২

I ধি না । ধি ধি নাগে তেটে I

পরিচয়

এই তালটি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত। এই তালেব ৬টি মাত্রা। দুইটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে দুইটি ও দ্বিতীয় বিভাগে চাবিটি মাত্রা আছে। ইহার দুইটিই তাল। কোন ফাঁক নাই।

ষষ্ঠী-তালের দ্বিগুণ

১´ ২

I ধিনা ধিধি । নাগেতেটে ধিনা ধিধি নাগেতেটে I

রূপক-তাল ঃ ৭ মাত্রা

[মূল ঠেকা * বরাবর লয়]

০ ১ ২

I তি তি না । ধি না । ধি না I

পরিচয়

এই তালের ৭টি মাত্রা। তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে তিনটি ও দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগে দুইটি করিয়া মাত্রা আছে। ইহার একটি ফাঁক ও দুইটি তাল। প্রথম মাত্রায় ফাঁক ও চতুর্থ, ষষ্ঠ মাত্রায় তাল।

রূপক-তালের দ্বিগুণ

১ ২

I তিতি নাধি নাধি । নাতি তিনা । ধিনা ধিনা I

তাল-রূপকড়া : ৮ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´ ২ ৩

I ধি ধি না । ধি না । ধি ধি না I

পরিচয়

এই তালটি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত। এই তালের ৮টি মাত্রা। তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে তিনটি, দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি ও তৃতীয় বিভাগে তিনটি মাত্রা আছে। তিনটিই তাল। কোন ফাঁক নাই।

রূপকড়া তালের দ্বিগুণ

১´ ২ ৩

I ধিধি নাধি নাধি । ধিনা ধিধি । নাধি নাধি ধিনা I

॥ কয়েকটি সমমাত্রিক তালের পরস্পর তুলনা ॥

কাহারবা ও রূপকড়া

১´ ০

কাহারবা তালের ঠেকা : I ধা গে না তি । না গে ধি না I

১´ ২ ৩

রূপকড়া তালের ঠেকা : I ধি ধি না । ধি না । ধি ধি না I

উভয় তালের ৮টি মাত্রা। কাহারবা তালের দুইটি বিভাগ ও রূপকড়া তালের তিনটি বিভাগ। কাহারবা তালের প্রতি বিভাগে চারিটি করিয়া করিয়া মাত্রা আছে ও রূপকড়া তালের প্রথম বিভাগে তিনটি, দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি ও তৃতীয় বিভাগে তিনটি মাত্রা আছে। কাহারবা তালের একটি তাল ও একটি ফাঁক ও রূপকড়া তালের তিনটিই তাল, কোন ফাঁক নাই। কাহারবা তালের প্রথম মাত্রায় সম্ ও পঞ্চম মাত্রায় ফাঁক আর রূপকড়া তালের প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায় তাল।

দাদরা ও ষষ্ঠী তাল

১´ ০

দাদরা তালের ঠেকা : I ধা ধি না । ধা তি না I

১´ ২

ষষ্ঠী তালের ঠেকা : I ধি না । ধি ধি নাগে তেটে I

উভয় তালের ৬টি মাত্রা। উভয় তালের দুইটি বিভাগ। দাদরা তালের প্রতি বিভাগে তিনটি করিয়া মাত্রা আছে এবং ষষ্ঠী তালের প্রথম বিভাগে দুইটি ও দ্বিতীয় বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। দাদরা তালের একটি তাল ও একটি ফাঁক এবং ষষ্ঠী তালের দুইটিই তাল, কোন ফাঁক নাই। দাদরা তালের প্রথম মাত্রায় সম ও চতুর্থ মাত্রায় ফাঁক আর ষষ্ঠী তালের প্রথম ও তৃতীয় মাত্রায় তাল।

তেওরা ও রূপক

১´ ২ ৩

তেওরা তালের ঠেকা : I ধি ধি না । ধি না । ধি না I

০ ১ ২

রূপক তালের ঠেকা : I তি তি না । ধি না । ধি না I

উভয় তালের সাতটি মাত্রা। উভয় তালের তিনটি বিভাগ। উভয় তালের প্রথম বিভাগে তিনটি ও দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগে দুইটি করিয়া মাত্রা আছে। তেওরা তালের তিনটিই তাল কোন ফাঁক নাই ও রূপক তালের দুইটি তাল ও একটি ফাঁক। তেওরা তালের প্রথম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ মাত্রায় তাল আর রূপক তালের প্রথম মাত্রায় ফাঁক ও চতুর্থ, ষষ্ঠ মাত্রায় তাল।

॥ সাঙ্গীতিক পরিভাষা ॥

বাদী

পণ্ডিত অহোবল তাঁহার "সঙ্গীত পারিজাত" গ্রন্থে বলিয়াছেন—প্রয়োগো বহুধা যস্য বাদিনং ত্বং স্বরং জগুঃ। রাজত্বমপি তস্যেতি।

রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহের মধ্যে যে স্বরটি বেশী প্রাধান্য লাভ করে অর্থাৎ রাগে যে স্বরের প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা বেশী হয় তাহাকে **বাদী** বা প্রধান স্বর কহে। যেমন ইমন রাগে "গা" হইল বাদী স্বর। বাদী স্বরকে রাজার সহিত তুলনা করা হয়। একটি রাগের সহিত একটি রাজ্যের তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন একটি রাজ্যে রাজার প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী থাকে, তেমনি একটি রাগেও বাদী স্বরের প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী থাকে। তাহা ছাড়া এই বাদী স্বর অনুসারেই রাগের পূর্বাঙ্গ, উত্তরাঙ্গ এবং রাগ পরিবেশনের সময় নির্ধারণ করা যায়। এমন অনেক রাগ আছে যাহাতে একই স্বর ব্যবহার হয়, কিন্তু,বাদী স্বর প্রভেদে ঐ রাগের রূপ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়। যেমন ভূপালী ও দেশকার রাগের ব্যবহৃত স্বর—সা রা গা পা ধা র্সা। কিন্তু দুইটি রাগের বাদী স্বর ভিন্ন। ভূপালী রাগের বাদী স্বর গান্ধার কিন্তু দেশকার রাগের বাদী স্বর ধৈবত। ভূপালী রাগের বাদী স্বর সপ্তকের পূর্বাঙ্গে হওয়াতে পরিবেশনের সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। দেশকার রাগের বাদী স্বর সপ্তকের উত্তরাঙ্গে হওয়াতে পরিবেশনের সময় দিবা প্রথম প্রহর। সুতরাং দেখা যাইতেছে দুইটি রাগের

ব্যবহৃত স্বর এক হইলেও বাদী স্বর প্রভেদে রাগ পরিবেশনের সময় ও রাগের রূপ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যাইতেছে। অতএব রাগে বাদী স্বরের মহত্ত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী।

সমবাদী

রাগে যে স্বর বাদী স্বর অপেক্ষা কম, কিন্তু অন্যান্য স্বর অপেক্ষা বেশী ব্যবহার হয় তাহাকে **সমবাদী** কহে। সঙ্গীতদর্পণ গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"বাদী রাজাস্বরস্তস্য সংবাদী স্বাদমাত্যবৎ"—সম্বাদীস্বরকে রাগের মন্ত্রী বলা হয়। একটি রাজ্যে যেমন রাজার পরেই মন্ত্রীর প্রাধান্য বেশী থাকে, তেমনি একটি রাগেও বাদী স্বরের পরেই সমবাদী স্বরের প্রাধান্য বেশী থাকে। ইমন রাগের ব্যবহৃত স্বর সা রা গা হ্মা পা ধা না র্সা। ইহাদের মধ্যে গান্ধার হইল বাদী স্বর ও নিষাদ সমবাদী স্বর অর্থাৎ গান্ধার অপেক্ষা নিষাদের প্রাধান্য কম, কিন্তু সা রা হ্মা পা ধা এই স্বরগুলি অপেক্ষা নিষাদের প্রাধান্য বেশী। সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে সমশ্রুতি বিশিষ্ট স্বরদ্বয় পরস্পরের বাদী সমবাদী হয়। এবং বাদী স্বরের আরোহ অথবা অবরোহক্রমে ত্রয়োদশ শ্রুতিতে সমবাদী স্বরের অবস্থান নির্দেশ করা হয়।

অনুবাদী

বাদী সমবাদী বাদ দিয়া যে বাকী স্বরগুলি রাগ প্রকাশ করিতে সহায়তা করে, তাহাদিগকে **অনুবাদী** কহে। ইহাদের রাগের সেবক বা প্রজা বলা হয়। অহোবলের মতে "ভৃত্যতুল্যানুবাদী"— যেমন একটি রাজ্যে শুধু রাজা ও মন্ত্রী থাকিলেই রাজ্য চলে না সেখানে প্রজাদেরও প্রয়োজন হয়, তেমনি একটি রাগেও শুধু বাদী সমবাদী থাকিলেই রাগ গাওয়া যায় না। অনুবাদী স্বরগুলি রাগ গাহিতে সাহায্য করে। যেমন ইমন রাগের—সা রা হ্মা পা ধা এই স্বরগুলি হইল অনুবাদী স্বর।

বিবাদী

দুইটি স্বরের মধ্যে একটি শ্রুতি বিদ্যমান হইলে ঐ স্বর দুইটিকে পরস্পরের বিবাদী বিবেচনা করা হয়। যেমন শুদ্ধ ঠাটে গা ও মা পরস্পর বিবাদী স্বর। বিবাদী শব্দের অর্থ হইল শত্রু। অহোবলের মতে—বিবাদীশত্রুবদ্ভবেৎ—

রাগে যে স্বর নিয়মিত স্বর নহে অর্থাৎ রাগে যে স্বর প্রয়োগ করিলে রাগহানি বা রাগভ্রষ্ট হয় তাহাকে **বিবাদী** স্বর কহে। ইহাকে রাগের শত্রু বলা হয়। তবে কুশল গায়ক রাগের শুদ্ধতা নষ্ট না করিয়া কুশলতাপূর্বক মাঝে মাঝে এই স্বর প্রয়োগ করিয়া রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। বিবাদী স্বর রাগ-হানি করে বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে এই বিবাদী স্বর ক্ষণিকের জন্য অনুবাদী স্বরের ন্যায় প্রযোগ হইয়া থাকে। যেমন কেদার, কামোদ, হমীর প্রভৃতি রাগের অবরোহে কোমল 'ণা' এর প্রয়োগ। এই কোমল 'ণা' ইহাদের নিয়মিত স্বর না হইলেও রাগের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে।

রাগ

মনোরঞ্জনকারী স্বরবিস্তার ও স্বরসমূহকে **রাগ** বলা হয়। পণ্ডিত অহোবলের "সঙ্গীত পারিজাত" গ্রন্থে বলা হইয়াছে—রঞ্জকঃ স্বরসন্দর্ভো রাগ ইত্যভিধীয়তে। প্রাণীদের মনোরঞ্জন করে বলিয়াই রাগ। রাগ তিন প্রকার যথা :—**শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সঙ্কীর্ণ।**

শুদ্ধ রাগ ঃ—যে রাগ শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে গাওয়া হয় তাহাকে **শুদ্ধ রাগ** বলা হয়, যেমন :—বিলাবল।

ছায়ালগ রাগ ঃ—যে রাগ কোন শুদ্ধ রাগের সামান্য ছায়া অবলম্বনে গাওয়া হয় তাহাকে **সালঙ্ক** বা **ছায়ালগ রাগ** বলা হয়, যেমন :—ছায়ানট।

সঙ্কীর্ণ রাগ ঃ—শুদ্ধ ও ছায়ালগ রাগের মিশ্রণে যে সমস্ত রাগ গাওয়া হয় অর্থাৎ যাহাতে দুই এর অধিক রাগের মিশ্রণ থাকে তাহাকে **সঙ্কীর্ণ রাগ** বলা হয়, যেমন :—পিলু।

পূর্ব্বরাগ ও উত্তররাগ

পূর্ব্বরাগ :—যদি কোন রাগের বাদী স্বর সপ্তকের পূর্বাঙ্গে অর্থাৎ সা রা গা মা পা এই স্বরগুলির মধ্যে থাকে এবং উহা যদি বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টার মধ্যে পরিবেশন করা হয় তবে তাহাকে **পূর্ব্বরাগ** বলা হয়।

উত্তররাগ :—যদি কোন রাগের বাদী স্বর সপ্তকের উত্তরাঙ্গে অর্থাৎ মা পা ধা না র্সা এই স্বরগুলির মধ্যে থাকে এবং উহা যদি রাত্রি ১২টা হইতে পরদিন বেলা ১২টার মধ্যে পরিবেশন করা হয় তবে তাহাকে **উত্তররাগ** বলা হয়।

স্থায়ী

স্থায়ী হইল গানের প্রথম ভাগ। গানের প্রতিটি ভাগ গাহিবার পর এই অংশে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই অংশ হইতে গান আরম্ভ করা হয় ও এই অংশে ফিরিয়া আসিয়া গান শেষ করিতে হয়। এই অংশটি সাধারণতঃ মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে গাওয়া হয়।

অন্তরা

অন্তরা হইল গানের দ্বিতীয় ভাগ। এই ভাগের সীমারেখা সাধারণতঃ মধ্য ও তার সপ্তকের মধ্যে থাকে। মধ্য সপ্তকের গা মা পা হইতে আরম্ভ করিয়া তার সপ্তকের র্গা র্মা র্পা পর্যন্ত গাওয়া হয়।

জাতি

রাগের আরোহ অবরোহতে সব সময় সমান সংখ্যক স্বর ব্যবহার হয় না। কোন রাগে সাতটি, কোন রাগে ছয়টি আবার কোন রাগে পাঁচটি করিয়া স্বর ব্যবহার হয়। ইহাকে রাগের **জাতি** বলা হয়। রাগ সাধারণতঃ তিন জাতীয় মানা হয়, যথা :—**সম্পূর্ণ, খাড়ব ও ঔড়ব**।

সম্পূর্ণ :—যে রাগের আরোহ অবরোহতে সাতটি করিয়া স্বর ব্যবহার হয়

তাহাকে সম্পূর্ণ জাতি বলা হয়। যেমন—ভৈরব রাগে আরোহ অবরোহতে সাতটি করিয়া স্বর ব্যবহৃত হয়।

খাড়ব ঃ—যে রাগের আরোহ অবরোহতে ছয়টি করিয়া স্বর ব্যবহার হয় তাহাকে খাড়ব জাতি বলা হয়। যেমন—মারবা রাগে 'পা' ব্যতীত অন্য ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

ঔড়ব ঃ—যে রাগের আরোহ অবরোহতে পাঁচটি করিয়া স্বর ব্যবহার হয় তাহাকে ঔড়ব জাতি বলা হয়। যেমন—ভূপালী রাগে 'মা' এবং 'নি' ব্যতীত অন্য পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হয়।

যদিও রাগ সাধারণতঃ তিন জাতীয় মানা হয় কিন্তু আরোহ ও অবরোহে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে রাগ নয় জাতীয় হয়। যথা ঃ

[১] সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ	[২] সম্পূর্ণ—খাড়ব	[৩] সম্পূর্ণ—ঔড়ব
[৪] খাডব—সম্পূর্ণ	[৫] খাডব—খাড়ব	[৬] খাড়ব—ঔড়ব
[৭] ঔড়ব—সম্পূর্ণ	[৮] ঔডব—খাডব	[৯] ঔড়ব—ঔডব।

স্বরমালিকা বা স্বরগম্‌গীত

রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহকে তালবদ্ধভাবে রচনা করিলে তাহাকে **স্বরমালিকা** বা **স্বরগম্‌গীত** কহে। এই গীতের রচনা কেবল স্বরেরই মাধ্যমে হইয়া থাকে স্বরমালিকা বিভিন্ন রাগে ও বিভিন্ন তালে গাওয়া হইয়া থাকে।

লক্ষণগীত

যে গীতে রাগের নাম, বাদী, সমবাদী, জাতি, সময় ও আরোহ অবরোহ প্রভৃতির উল্লেখ থাকে তাহাকে **লক্ষণগীত** বলা হয়। লক্ষণগীতে রাগের মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

জনকঠাট

যে সকল ঠাট হইতে রাগ উৎপন্ন হয় তাহাদের **জনকঠাট** বলা হয়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দশটি ঠাটের উল্লেখ আছে। অতএব এই দশটি ঠাটকেই জনকঠাট কহে।

জন্য রাগ

জন্য অর্থে জাত বা যাহার জন্ম হইয়াছে। ঠাট হইতে রাগের জন্ম হয়, অতএব রাগ মাত্রই **জন্যরাগ**। যেমন—কাফী ঠাট হইতে বাগেশ্রী, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি রাগের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব এই রাগগুলিকে জন্যরাগ বলা হয়।

আশ্রয় রাগ

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রচলিত রাগগুলিকে কোন না কোন ঠাটের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক ঠাটেই এমন একটি করিয়া রাগ আছে যাহার নামে ঠাটের নামকরণ করা হইয়াছে। সেই রাগটি হইল এই ঠাটের **আশ্রয়রাগ**। যে কোন জন্যরাগ গাহিবার সময় ঠাটবাচক রাগটির অল্পাধিক সাহায্য লওয়া হয়, সেই কারণেই এই ঠাটবাচক রাগটিকে আশ্রয়রাগ বলা হয়। যেমন ভৈরব ঠাট হইতে ভৈরব রাগের উৎপত্তি হইয়াছে অতএব এই ভৈরব রাগটি হইল ভৈরব ঠাটের আশ্রয়রাগ।

গ্রহ, অংশ, ন্যাস

গ্রহ ঃ—প্রাচীনকালে গ্রহ স্বর বলিতে সেই স্বরকেই বুঝাইত যাহা গানের আদিতে থাকিত। অর্থাৎ যে স্বর হইতে রাগ পরিবেশন আরম্ভ করা হইত সেই স্বরটিকেই **গ্রহ স্বর** বলা হইত। সঙ্গীতজ্ঞ নারায়ণ গ্রহ স্বরের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন—গ্রহস্বরঃ স ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ।

অংশঃ—প্রাচীনকালে অংশ স্বর বলিতে সেই স্বরকে বুঝাইত, যাহা রাগবাচক ; অন্য সকল স্বর যাহার অধীন ; যাহার বহুল ব্যবহার হয় এবং রাগে ব্যবহৃত স্বরসমষ্টির অংশমাত্র হইলেও যেন বহুজনের মধ্যে রাজার ন্যায় প্রধান সেই স্বরকেই **অংশ স্বর** বলা হইত। অংশ স্বরের সংজ্ঞায় নারায়ণ লিখিয়াছেন—যো ব্যক্তি ব্যঞ্জকো গানে যস্য সর্বেনুগামিনঃ।

যস্য সর্বত্র বাহুল্যম্ বাদ্য অংশোঽপি নৃপোত্তমঃ ॥

অংশস্বর রাগ নির্ণয় করে। রাগে মুখ্য স্বর হিসাবে অংশ স্বরটিকে আমরা বর্তমানে বাদী স্বর বলিতে পারি।

ন্যাসঃ—প্রাচীনকালে যে স্বরের উপর রাগরাগিণী সমাপ্ত করা হইতে সেই স্বরটিকেই **ন্যাস স্বর** বলা হইত। ন্যাস স্বরের সংজ্ঞায় নারায়ণ বলিয়াছেন—

"ন্যাস স্বরস্তু স প্রোক্তো যে গীতাদি সমাপ্তি চ।"

বর্তমানে ন্যাস শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। রাগের স্বরগুলির মধ্যে যে যে স্বরের উপর গায়ক-বাদক কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া রাগের স্বরূপ প্রকাশ করেন তাহাদের ন্যাস স্বর বলা হয়।

বক্রস্বর

রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির মধ্যে কোন কোন স্বর ক্রমানুসারে প্রয়োগ না করিয়া বক্রভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই বক্রভাবে প্রয়োগ করা স্বরই **বক্রস্বর**। যেমন হমীর রাগের—আরোহ ঃ—সা রা সা, গা মা ধা, না ধা র্সা। ইহাদের মধ্যে 'না' হইল বক্রস্বর।

বর্জ বা বর্জিত স্বর

রাগে যে স্বরের প্রয়োগ নিষিদ্ধ থাকে তাহাকে **বর্জ** বা **বর্জিত স্বর** কহে। যেমন ভূপালী রাগে মা ও না হইল বর্জ বা বর্জিত স্বর। বর্জ ও বিবাদী স্বরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্জিত স্বর কখনও রাগে ব্যবহার হয় না, আর বিবাদী স্বর রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে অল্প প্রয়োগ হইয়া থাকে।

বিভাগ

প্রতিটি তালের মাত্রা সমষ্টিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। তালের এই ভাগকে **বিভাগ** কহে। যেমন ত্রিতাল ১৬ মাত্রার তাল। ইহাকে **সমান** চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই চারিটি ভাগের প্রতিটি ভাগকে **এক** একটি বিভাগ বলা হয়।

আবর্তন

তালের এক সম্ হইতে পরের সম্ পর্যন্ত একবার পরিক্রমা করাকে এক আবর্তন কহে অর্থাৎ তালের পূর্ণ এক চক্রের নাম **আবর্তন**।

কণ বা স্পর্শ স্বর

কণ শব্দের অর্থ স্পর্শ করা বা ছোঁওয়া। কোন স্বর উচ্চারণ কালে যদি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরকে অল্প স্পর্শ করিয়া আসে তবে তাহাকে **কণ** বা **স্পর্শ স্বর** কহে। স্বরলিপিতে কণগুলিকে মূল স্বরের মাথায় ছোট আকারে লেখা
ম প
থাকে যেমন পা মা। এই মা ও পা হইল স্পর্শ স্বর।

॥ আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

স্বর

সাতটি শুদ্ধ স্বর—যথা : স র গ ম প ধ ন।

চারিটি কোমল স্বর—যথা : ঋ জ্ঞ দ ণ।

একটি তীব্র বা কড়ি স্বর—যথা : হ্ম।

সপ্তক

মন্দ্র বা উদারা সপ্তকের স্বরের নীচে হসন্ত বসে। যথা: প্‌া ধ্‌া ন্‌া।
মধ্য বা মুদারা সপ্তকের স্বরের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা: গা মা পা।
তার বা উচ্চ সপ্তকের স্বরের মাথায় রেফ্ বসে। যথা: র্সা র্রা র্গা।

স্বরমান

প্রতিটি স্বর একমাত্রা—যথা—সা রা গা মা ।
একমাত্রার চিহ্ন— যথা— -া ।
অর্ধমাত্রার চিহ্ন— যথা— : ।
দুইটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা—যথা—সরা ।
চারিটি সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা—যথা—সরগমা ।
দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া অর্ধমাত্রা—যথা—সরঃ ।
একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা—যথা—সঃ গরঃ।
একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা—যথা—রাঃ গঃ।

তাললিপি

তালের মাত্রা সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত। প্রত্যেক গুচ্ছের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে ১, ২, ৩, ৪, ০, ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা বিভিন্ন তালাঙ্ক নির্দেশ করে। "০" এইরূপ শূন্য থাকিলে ফাঁক বুঝিতে হইবে এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে (১́, ২́) এইরূপ রেফ চিহ্ন থাকিবে তাহাকেই সম্ বুঝিতে হইবে।

তাল বিভাগের চিহ্ন পাশে " । " এইরূপ দাঁড়ি বসে। সম হইতে পরের সম পর্যন্ত একফেরা গাওয়া হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে "I" এইরূপ দণ্ড বসে। আস্থায়ীতে প্রত্যাবর্তনের চিহ্ন স্বরূপ "II" এইরূপ দুইটি দণ্ড বসে। প্রতিটি কলির প্রথমে এবং শেষে দুইটি দণ্ড বসে এবং গান একেবারে শেষ হইয়া গেলে "II II" এইরূপ চারিটি দণ্ড বসে।

অবসানের চিহ্ন স্বরের মাথায় "সা" এইরূপ যুগল দাঁড়ি বসে। এই পর্যন্ত গাহিয়া গানের অন্য কলি ধরিতে হয় এবং এই পর্যন্ত গাহিয়া গান শেষ করিতে হয়।

পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } এইরূপ গুম্ফ বন্ধনী, এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন ( ) এইরূপ বক্রবন্ধনী।

যথা—{ সা রা (গা মা) } । মা পা ।

পুনরাবৃত্তিকালে কোন স্বরের পরিবর্তন হইলে শিরোদেশে [ ] এইরূপ সরল বন্ধনীর মধ্যে পরিবর্তিত স্বরগুলি স্থাপিত হয়; যথা—[রা গা]
{ সা রা গা }

কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সর্বশেষে দুই প্রস্থ যুগল দণ্ডের মধ্যে [ ] এইরূপ সরল বন্ধনী থাকিলে, I [ ] I, II [ ] II আস্থায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত স্বর গাহিতে হয়।

স্বরসৌন্দর্য

যখন কোন স্বর এক স্বর হইতে অপর স্বরে বিশেষভাবে গড়াইয়া যায় তখন স্বরের নীচে "‿" এইরূপ মীড়ে চিহ্ন বসে। যথা ণা পা।

কোন মূল স্বর উচ্চারণকালে যদি তাহার পূর্ববর্তী কোন আনুষঙ্গিক স্বরকে সামান্য স্পর্শ করিয়া আসে তখন সেই স্বরটি মূল স্বরের বামপার্শ্বে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হয়। যথা—রগা গমা ইত্যাদি।

মূল স্বরের পরবর্তী কোন স্বরের সামান্য রেশ থাকিলে ঐ মূল স্বরের দক্ষিণপার্শ্বে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত হয়। যথা—রাস।

উচ্চারণ

স্বরের নীচে যখন গানের অক্ষর থাকে না; তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির

বামপার্শ্বে (-) এইরূপ হাইফেন বসে এবং গানের পংক্তিতে (॰) এইরূপ শূন্য দেওয়া হয়। যেমন—

সা -া -া -া । সা -রা -গা -মা ।
মা ॰ ॰ ॰ অথবা মা ॰ ॰ ॰

নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে স্বরের বামপার্শ্বে (-) এইরূপ হাইফেন বসে। যথা—

সা -রা -গা -মা । সা -া -া -া ।
গা ॰ ॰ ন্ গা ॰ ॰ ন্

॥ ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি ॥

স্বর

১. শুদ্ধ স্বরের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা :—সা রে গ ম প ধ নি।
২. কোমল স্বরের নীচে '—' এইরূপ রেখা বসে। যথা :—রে গ ধ নি।
৩. তীব্র বা কড়ি স্বরের মাথায় লম্ব দাঁড়ি বসে। যথা :—মঁ ॥

সপ্তক

৪. মন্দ্র সপ্তকের স্বরের নীচে বিন্দু বসে। যথা : গ় ম় প় ইত্যাদি ॥
৫. মধ্য সপ্তকের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা : "গ ম প" ইত্যাদি ॥
৬. তার সপ্তকের স্বরের মাথায় বিন্দু বসে। যথা : গঁ মঁ পঁ ইত্যাদি ॥

স্বরমান

৭. এক মাত্রার মধ্যে একটি স্বর হইলে পৃথক পৃথকভাবে লিখিতে হইবে—যথা : গ ম প ধ ইত্যাদি।
৮. এক মাত্রার মধ্যে একের অধিক স্বর হইলে ঐ স্বরগুলির নীচে "⌣"। যথা : গম, গমপ, গমপধ ইত্যাদি।

৯. একটি স্বর একের অধিক মাত্রা হইলে ঐ স্বরের ডানদিকে "—" এইরূপ ড্যাস চিহ্ন বসে। যথা : গ—অর্থাৎ গ হইল দুই মাত্রা।

তাললিপি

১০. "।" এইরূপ দাঁড়ি দ্বারা তালের বিভাগ বুঝান হয়।

১১. "×" এইরূপ ক্রস্ চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়।

১২. "O" এইরূপ শূন্য দ্বারা খালি বা ফাঁক বুঝান হয়।

১৩. "২, ৩, ৪, ৫" এইরূপ সংখ্যা দ্বারা তালী বুঝান হয়।

স্বরসৌন্দর্য

১৪. স্বরের মাথায় অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা মীড বুঝান হয়।

যথা : প গ।

১৫. কণ্ বা স্পর্শ স্বর মূল স্বরের বামদিকে ছোট আকারে

ম প

লেখা থাকে—যথা : প, ধ।

১৬. বক্র বন্ধনীর মধ্যে কোন স্বর থাকিলে ঐ স্বরের পরবর্তী স্বর ও বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বর এবং ঐ স্বরের পূর্ববর্তী স্বর ও বন্ধনীর মধ্যস্থিত স্বর একসঙ্গে দ্রুতগতিতে উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহাকে খটকার কাজ বলা হয়—যথা : (প)=ধপমপ, (ম)=পমগম ।

গীত উচ্চারণ

১৭. যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না তখন স্বরের ডানদিকে এইরূপ ড্যাস বসে ও গানের পংক্তিতে (ऽ) এইরূপ অবগ্রহ বসে। যথা :

সা - - -
মা ऽ ऽ ऽ।

॥ বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপি পদ্ধতি ॥

স্বর

১. শুদ্ধ স্বরের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা : সা রে গ ম প ধ নি।

২. কোমল স্বরের নীচে হসন্ত বসে। যথা : রে্ গ্ ধ্ নি্।

৩. তীব্র স্বরের ডানপাশে ঊর্ধমুখী বক্ররেখা দেওয়া হয়। যথা : ম/।

সপ্তক

৪. মন্দ্র সপ্তকের স্বরের মাথায় বিন্দু বসে। যথা : গং মং পং।

৫. মধ্য সপ্তকের স্বরের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা : গ ম প।

৬. তার সপ্তকের স্বরের মাথায় লম্ব দাড়ি বসে। যথা : গ̍ ম̍ প̍।

স্বরমান

৭. এক মাত্রার মধ্যে একটি স্বর হইলে স্বরগুলি পৃথক পৃথক ভাবে লিখিয়া স্বরের নীচে সমান রেখা দেওয়া হয়।

যথা : রে গ ম প ইত্যাদি।

৮. এক একটি স্বর দুইমাত্রা হইলে স্বরের নীচে "ঽ" এইরূপ চিহ্ন বসে। যথা : রে গ ম প।
ঽ ঽ ঽ ঽ

৯. এক একটি স্বর চারি মাত্রার হইলে স্বরের নীচে "×" এইরূপ চিহ্ন বসে। যথা : রে গ ম প।
× × × ×

১০. এক একটি স্বর অর্ধমাত্রা হইলে প্রতিটি স্বরের নীচে "o" এইরূপ শূন্য দেওয়া হয়। যথা : রে গ ম প।
o o o o

১১. এক একটি স্বর সিকিমাত্রা অর্থাৎ ¼ মাত্রা হইলে প্রতিটি স্বরের নীচে অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন দেওয়া হয়।ঃ যথা রে গ ম প।

১২. এক একটি স্বর ⅛ মাত্রা হইলে প্রতিটি স্বরের নীচে পর পর দুইটি অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে। যথা: রে গ ম প।

তাললিপি

১৩. "।" এইরূপ চিহ্ন দ্বারা তাল বিভাগ বুঝান হয়।

১৪. "১" এইরূপ চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়।

১৫. "+" এইরূপ চিহ্ন দ্বারা খালি বা ফাঁক বুঝান হয়।

১৬. সম ও ফাঁক ভিন্ন অপর বিভাগগুলিতে মাত্রার সংখ্যা দেওয়া হয়।

স্বরসৌন্দর্য

১৭. স্বরের মাথায় অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন দ্বারা মীড় বুঝান হয়।

যথা: প রে।

১৮. স্পর্শস্বর মূল স্বরের বামদিকে ছোট আকারে লেখা থাকে।

ম গ
যথা: প, ম।

১৯. খটকা—যথা: (ম)=পমগম (প)=ধপমপ

গীত উচ্চারণ

২০. যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না তখন স্বরের ডানদিকে 'ঽ' এইরূপ চিহ্ন বসে ও গানের পংক্তিতে (॰) এইরূপ অবগ্রহ বসে।

যথা: ম ঽ ঽ সা
শ্যা ॰ ॰ ম

ভানুসিংহের পদাবলীর বৈশিষ্ট্য

ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মনামে এই পদগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনার প্রেরণা কবি লাভ করিয়াছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র সংকলিত 'মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা'য় রচিত প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ হইতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন : "শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মৈথিলীমিশ্রিত ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ ছিল। কিন্তু সেইজন্যই এত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমি তাহার মধ্যে প্রবেশচেষ্টা করিয়াছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে অঙ্কুর-প্রচ্ছন্ন ও মাটির নীচে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত, তাহার প্রতি যেমন একটি একান্ত কৌতূহল বোধ করিতাম, প্রাচীন পদকর্তাদের রচনা সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল; আবরণ মোচন করিতে করিতে একটি অপরিচিত ভাণ্ডার হইতে একটি-আধটি কাব্য-রত্ন চোখে পড়িতে থাকিবে, এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেষ্টায় যখন আছি তখন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্য-আবরণে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।"

উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে ভানুসিংহের পদাবলী রচনার প্রেরণা-উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। এই রচনা সম্বন্ধে জীবনস্মৃতি গ্রন্থে কবির বর্ণনা খুবই কৌতুকপ্রদ :

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ীর ভিতরে এক ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটা শ্লেট লইয়া লিখিলাম 'গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে'। লিখিয়া ভারি খুশি হইলাম; তখনই এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম বুঝিতে পারিবার আশঙ্কা-মাত্র যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "বেশ তো, এ তো বেশ হইয়াছে।"

পূর্বলিখিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম, "সমাজের লাইব্রেরী খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটা জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ-নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ কাপি করিয়া আনিয়াছি।" এই বলিয়া তাঁহাকে কবিতাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া তিনি বিষম বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিতান্তই চাই। এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ছাপিবার জন্য ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তখন আমার খাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম, এ লেখা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়া নিশ্চয়ই বাহির হইতে পারে না, কারণ এ আমার লেখা। বন্ধু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "নিতান্ত মন্দ হয় নাই।"

ভানুসিংহ যখন ভারতীতে বাহির হইতেছিল[১] ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন জর্মনিতে ছিলেন।[২] তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্য সম্বন্ধে একখানি চটি-বই[৩] লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ভানুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোন আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া তিনি ডাক্তার উপাধী লাভ করিয়াছিলেন।

'বাংলা ১২৯১ সালে প্রথম প্রকাশ-কালে একুশটি রচনা ছিল। আর একটি ভানুসিংহের পদ (কো তুঁহু বোলবি মোয়) ১২৯২ সালের 'প্রচার' মাসিকপত্রে এবং পরে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের অনুসরণে প্রাচীন ব্রজবুলিতে এই গান বা কবিতাগুলির রচনা পুরাতন হইলেও, ইহার মধ্যে অনেকগুলি কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'তেও প্রকাশ পায়।...'

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে মোট এই বাইশটি পদ আছে:

১. আজু সখি মুহু মুহু : স্বরবিতান ২১

২. কো তুঁহু বোলবি মোয় : ইমনকল্যাণ

৩.	গহন কুসুমকুঞ্জ-মাঝে :		স্বরবিতান ২১
৪.	বজাও রে মোহন বাঁশি :		স্বরবিতান ২১
৫.	বঁধুয়া হিয়া-পর আও রে :	ভৈরবী	
৬.	বসন্ত আওল রে :	বাহার	
৭.	বাদরবরখন, নীরদগরজন :	মল্লার	
৮.	বার বার সখী, বারণ করনু :	ইমনকল্যাণ	
৯.	মরণ রে তুঁহু মম :		স্বরবিতান ২১
১০.	মাধব, না কহ আদরবানী :	বাহার	
১১.	শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা :		স্বরবিতান ২১
১২.	শুন লো শুন লো বালিকা :		স্বরবিতান ২১
১৩.	শুন সখি, বাজই বাঁশি :	বেহাগ	
১৪.	শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে :	খাম্বাজ	
১৫.	শ্যাম রে, নিপট কঠিন-মন তোর :	বেহাগড়া	
১৬.	সখী রে, পিরীত বুঝবে কে :	টোড়ী	
১৭.	সখী লো, সখী লো, নিকরুণ মাধব :	দেশ	
১৮.	সজনী, সজনী, রাধিকা লো :		স্বরবিতান ২১
১৯.	সতিমির রজনী, সচকিত সজনী :		স্বরবিতান ২১
২০.	হম যব না রব সজনী :	বেহাগ	
২১.	হম সখী, দারিদ নারী :	ভৈরবী	
২২.	হৃদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে :		স্বরবিতান ২১

উল্লিখিত বাইশটি পদের মধ্যে মাত্র নয়টি পদের সংগীতলিপি স্বরবিতান একবিংশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী তেরোটি পদের সুর সম্ভবত আর কোন কালে পাওয়া যাইবে না। রচনার ভাষা ও সুর মনোযোগের সহিত বিচার করিলে দেখা যাইবে, ভানুসিংহের পদগুলিতে বৈষ্ণব পদাবলীর, বিশেষ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের যুগের পদাবলীর প্রভাব আছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :

"বৈষ্ণব গীতিকবিতায় কথা ও সুরের সমান মধুরতা। যেন একটি পাখীর দুইটি পক্ষ। এই দুই পক্ষে ভর দিয়া সাধনসিদ্ধ গায়কের সঙ্গে ভাবুক ও রসিক শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তকেও উধাও করিয়া বৈষ্ণবের গান যে কল্পলোকে লইয়া যায় তাহা কোন কাল্পনিক জগৎ নহে। বৈষ্ণব কবিগণের অনুভূতিতে সেই চিদানন্দময় ধামও যেমন সত্য, এই নিত্যনূতন লীলাও তেমনই সত্য। কবিগণ তাহার সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা।"

মনোহরসাহী, গরাণহাটি ও রেণেটি বাংলা কীর্তন গানে এই তিন ঢংয়ের কোন ঢংয়ে ভানুসিংহের পদাবলী গাওয়া হয় না। কীর্তন গানের যেভাবে আখর প্রয়োগ করা হয় ভানুসিংহের পদাবলীর কোন গানে সেভাবে আখর প্রয়োগ করা হয় না। বাংলা কীর্তন গানে যে সকল বড় তালের প্রয়োগ হয় তাহা ভানুসিংহের পদাবলীতে প্রয়োগ হয় না।

॥ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ॥

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলে প্রথম স্বদেশী গানের বিশেষভাবে সূচনা হয় হিন্দুমেলার যুগে, ১৮৬৭ সালে। এই সময় আমরা নিজের শক্তির প্রতি, নিজের সংস্কৃতির প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে অভ্যস্থ হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই রকম নির্জীব নৈরাশ্যের ভাবকে দূর করিবার প্রচেষ্টা হইতেই মনে হয় হিন্দুমেলা আন্দোলনের উৎপত্তি। গুরুদেবের পরিবারের সকলে ছিলেন এ বিষয়ে প্রধান উৎসাহী। এই হিন্দুমেলার উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৮৭৬ সালে 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলার এই স্বদেশীকতার আবহাওয়ার পরিবেশে এবং জীবনস্মৃতিতে উল্লিখিত

সঞ্জীবনী সভার আবহাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে কিছু গান ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং জাতির একত্ববোধই ছিল এই গানগুলির বিষয়বস্তু। সঞ্জীবনী সভা উপলক্ষে রচিত তাঁহার গান 'একসূত্রে বাঁধা আছি' একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি এই সময়ের কাছাকাছি আরো কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন, যেমন 'তোমারি তরে মা সপিনু এ দেহ', 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' ও 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু।

গুরুদেবের জীবনে ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশী গানের যে বন্যা আসিয়াছিল, সেই যুগটি স্বদেশী গান রচনার ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়। এই সময়ের গানের আন্তরিকতা ও উন্মাদনা খুব বড়ো হইয়া ফুটিয়াছিল। স্বদেশীযুগে লেখা গুরুদেবের গান সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছিলেনঃ "এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে গান শুনিয়া, তরী ভাসাইব কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে।" সেদিন এই উন্মাদনাই ছিল বড় কথা, কারণ দেশের জন্য দুঃখ কষ্ট বরণ করা, প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকেও নির্ভয়ে বরণ করার প্রবৃত্তি তখন যদি না জাগিত তবে রাষ্ট্রীয় আত্মচেতনা ভারতব্যাপী বিস্তৃত হইয়া পড়িতে আরো বিলম্ব হইত।

১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার গানে হিন্দী রাগরাগিণীতেই সুর যোজনা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া যথাসম্ভব রাগ-রাগিণী বজায় রাখিয়া সেই সব গান রচনা করিয়াছেন। কেবল কীর্তনাঙ্গ সুরে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' ও রামপ্রসাদী প্রথায় 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গান দুইটিতে বাংলাদেশের নিজস্ব সুরের রূপ দেখা গিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই প্রথম বাউল সারি ইত্যাদি বাঙলার নিজস্ব সুরের প্রাধান্য প্রবলভাবে দেখা দিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী গানের সুরের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বাউল সুরে স্বদেশী গান বাঁধিতে আর চেষ্টা করেন নাই। এই সময়ে রচিত স্বদেশ পর্যায়ের গানগুলির কাব্য ও সুরের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র।

রচনাকালক্রমে এই পর্যায়ের গানগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে রচিত, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত ও তৎপরবর্তী কালে রচিত। তাহার মধ্যে ১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রচিত গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের [১৩১২ সাল] পূর্বে রচিত গান :

১। ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণু :
২। অয়ি বিষাদিনী বীণা :
৩। তোমারি তরে মা, সঁপিনু এ দেহ : স্বরবিতান ৪৭
৪। এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন : স্বরবিতান ৪৭
৫। শোনো শোনো আমাদের ব্যথা : স্বরবিতান ৪৭
৬। একি অন্ধকার এ ভারতভূমি : স্বরবিতান ৪৭
৭। ঢাকো রে মুখ চন্দ্রমা : স্বরবিতান ৪৭
৮। দেশে দেশে ভ্রমি : স্বরবিতান ৪৭
৯। তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ : স্বরবিতান ৪৭
১০। কেন চেয়ে আছ গো মা : স্বরবিতান ৪৭
১১। একবার তোরা মা বলিয়া ডাক : স্বরবিতান ৪৭
১২। কে এসে যায় ফিরে ফিরে : স্বরবিতান ৪৭
১৩। হে ভারত, আজি তোমারি : স্বরবিতান ৪৭
১৪। নব বৎসরে করিলাম পণ
১৫। আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে : স্বরবিতান ৪৭
১৬। আগে চল্, আগে চল্ : স্বরবিতান ৪৭
১৭। আমায় বোলোনা গাহিতে : স্বরবিতান ৪৭
১৮। অয়ি ভুবনমনোমোহিনী : স্বরবিতান ৪৭
১৯। জননীর দ্বারে আজি ওই : স্বরবিতান ৪৬

২০। আজি এ ভারত লজ্জিত হে : স্বরবিতান ৪৭

২১। আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে : স্বরবিতান ৪৭

এই গানগুলি প্রায়ই রাগভিত্তিক। একমাত্র ১১নং গানখানি রামপ্রসাদী সুরে রচিত। সুর প্রয়োগের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন অন্যান্য গানের সহিত অল্পবিস্তর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে [১৩১২ সাল] রচিত গান :

১। আমার সোনার বাংলা : স্বরবিতান ৪৬

২। ও আমার দেশের মাটি : স্বরবিতান ৪৬

৩। যদি তোর ডাক শুনে কেউ : স্বরবিতান ৪৬

৪। তোর আপন জনে ছাড়বে : স্বরবিতান ৪৬

৫। এবার তোর মরা গাঙে : স্বরবিতান ৪৬

৬। নিশিদিন ভরসা রাখিস : স্বরবিতান ৪৬

৭। আমি ভয় করব না : স্বরবিতান ৪৬

৮। আপনি অবশ হলি : স্বরবিতান ৪৬

৯। বাংলার মাটি, বাংলার জল : স্বরবিতান ৪৬

১০। আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে : স্বরবিতান ৪৬

১১। সার্থক জনম আমার : স্বরবিতান ৪৬

১২। যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক : স্বরবিতান ৪৬

১৩। যে তোরে পাগল বলে : স্বরবিতান ৪৬

১৪। তোরা নেই বা কথা : স্বরবিতান ৪৬

১৫। যদি তোর ভাবনা থাকে : স্বরবিতান ৪৬

১৬। মা কি তুই পরের দ্বারে : স্বরবিতান ৪৬

১৭। ছি ছি চোখের জলে : স্বরবিতান ৪৬

১৮। বুক বেঁধে তুই দাঁড়া : স্বরবিতান ৪৬

১৯। আমরা পথে পথে যাব : স্বরবিতান ৪৩

২০। ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে : স্বরবিতান ৪৬

২১। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি : স্বরবিতান ৪৬

২২। খ্যাপা তুই আছিস : স্বরবিতান ৫১

২৩। ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না : স্বরবিতান ৪৬

২৪। আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে :

এই গানগুলিতে দুইটি প্রধান বিশেষত্ব আছে—বাউল সুরের প্রাধান্য ও বাউল সুরের গান ছাড়া অন্য গানের সুরের সহজগম্যতা। বাউল সুরের গান-গুলিতে সুরের সহজগম্যতা থাকিলেও তাহার ধারা স্বতন্ত্র। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন, জাতীয়তাবাদের জাগরণ, জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ভিত্তিতে গানগুলি রচিত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের [১৩:২ সাল] পরবর্তীকালে রচিত গান :

১। জনগনমন-অধিনায়ক : স্বরবিতান ৪৭

২। দেশ দেশ নন্দিত করি : স্বরবিতান ৪৭

৩। হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে : স্বরবিতান ৪৭

৪। আমাদের যাত্রা হল শুরু : স্বরবিতান ৪৭

৫। নাই নাই ভয়, হবে হবে জয় : স্বরবিতান ৩

৬। আমরা সবাই রাজা : স্বরবিতান ৪২

৭। সঙ্কোচের বিহ্বলতা : স্বরবিতান ৫

৮। মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন স্বরবিতান ৪৭

৯। চলো যাই চলো : স্বরবিতান ৪৭

১০। শুভ কর্মপথে ধর : স্বরবিতান ৪৭

১১। ওরে নূতন যুগের ভোরে : স্বরবিতান ৪৭

১২। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা : স্বরবিতান ৫৬

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সঙ্কীর্ণ স্বাজাত্যবোধ নহে। উহা বিশ্বমানবতার উদার প্রাঙ্গণে বিস্তৃত। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি পৃথিবীর যে কোন পরাধীন জাতির মানুষ আপনার বলিয়া সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের এক বিশেষ রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানবত্মার আকুতি প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বজনীনতাই ইহাদের বৈশিষ্ট্য।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব ॥

রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রাদেশিক সঙ্গীতের প্রভাব :

বিষয় বৈচিত্রের দিক হইতে রবীন্দ্রসঙ্গীত বহুমুখী। বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নানাবিধ গান অনুসরণ করিয়া তিনি অসংখ্য গান রচনা করিয়াছেন। নানাপ্রকার সুর সংগ্রহ করা কবির একটি নেশা ছিল। এ সম্বন্ধে ইন্দিরা দেবী তাঁহার রবীন্দ্র সঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

"কবি নিজে যেখানে যে ভালো সুরটি শুনেছেন, অথবা অন্য লোকে দেশ বিদেশ থেকে যে সব গান আহরণ করে তাঁকে দিয়েছেন, তার প্রায় সবগুলিই তিনি পূজার বেদীতে নিবেদম করেছেন, এ বললে অত্যুক্তি হয় না। মাঘোৎসবে নতুন নতুন গান সরবরাহের তাগিদ তার অন্যতম কারণ হতে পারে।"

দক্ষিণ ভারতের গানের সুরে বাংলা ভাষায় কয়েকটি গান লিখিয়াছেন। কর্ণাটী কতকগুলি গানকে বাংলা গানে রূপান্তরিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ে আত্মীয় ও নানাজনের নিকট হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গানের সুর শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল এবং সেই সুরগুলি তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এই কাজে বাড়ীর অন্যান্যদের নিকট হইতেও কম সাহায্য

পান নাই। তাঁহার ভাগেনেয়ী সরলা দেবী "জীবনের ঝরাপাতা" গ্রন্থে বলিয়াছেন:

"মহীশূর যখন গেলুম সেখান থেকে এক অভিনব ফুলের সাজি ভরে আনলুম। রবিমামার পায়ের তলায় গানের সাজি খালি করা না পর্যন্ত মনে বিরাম নেই। সাজি থেকে এক একখানি সুর তুলে নিলেন তিনি, মুগ্ধ চিত্তে নিজের কথা দিয়ে নিজের করে নিলেন—তবে আমার পূর্ণ চরিতার্থতা হল। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে', 'এসো হে গৃহদেবতা', 'একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, 'চিরবন্ধু চিরনির্ভর' প্রভৃতি আমার সুরে বসান গান।"

গুজরাটী ভজন ও পাঞ্জাবী বা শিখদের দোঁহা অবলম্বনে নানা গান রচনা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবী বা শিখ ভজন সম্পর্কে ইন্দিরা দেবী লিখিয়াছেন:

"শিখ ভজনও আমরা সুন্দর সুন্দর পেয়েছি। তার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর হল 'বাজে বাজে রম্য বীণা'। আমার মনে হয় এটি ভাঙা গানের রাজা—এই হিসেবে যে, যতদূর সম্ভব অল্প পরিবর্তনে[১] বিদেশীকে স্বদেশীতে পরিণত করা হইয়াছে, যেন একই স্বর্ণমুদ্রার এ পিঠ আর ও পিঠ। অবশ্য মূল গানের ['বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ'] ভাষাই তাঁকে সে সুযোগ দিয়েছে।"

এইভাবে কর্ণাট, মহীশূর, মাদ্রাজ, গুজরাট, পাঞ্জাব, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি যখন যেখানে গিয়াছেন উদার মনোভাবের সহিত সেখানকার গান শুনিয়া অনুরূপ ঢংয়ে গান রচনা করিয়াছেন। নিম্নে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি মূল গানের উদাহরণ দেওয়া হইল:

কর্ণাটী

[রবীন্দ্র সঙ্গীত]	[মূল গান]
১. বড়ো আশা করে	সখী বা বা
২. আজি শুভদিনে	পূর্ণ চন্দ্রাননে
৩. সকাতরে ওই কাঁদিছে	চারি বর্ষা পর্যন্ত
৪. অমৃত সদনে চলো যাই	মোহনে মোহিনী

মাদ্রাজী

[রবীন্দ্র সঙ্গীত]	[মূল গান]
১. বাজে করুণ সুরে	নিতু চরণ মূলে
২. নীলাঞ্জন ছায়া	বৃন্দাবন লোলা
৩. বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী	মীনাক্ষী মে মুদম
৪. বেদনায় কি ভাষায় রে	

মহীশূরী

[রবীন্দ্রসঙ্গীত]

১. আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে

২. এসো হে গৃহ দেবতা

৩. এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ

৪. চিরবন্ধু চিরনির্ভর

গুজরাটী

[রবীন্দ্রসঙ্গীত]

১. এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি

২. কোথা আছ প্রভু

৩. নমি নমি ভারতী

৪. যাওরে অনন্ত ধামে

৫. কখন দিলে পরায়ে স্বপনে মূল গান : কিন্হে দেখাকানহাইয়া প্যারা

পাঞ্জাবী

[রবীন্দ্রসঙ্গীত]	[মূল গান]
১. বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে	বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ
২. গগনের থালে রবিচন্দ্র	গগনোমো থাল, রবিচন্দ্র
৩. এ হরি সুন্দর	এ হরি সুন্দর

লক্ষ্ণৌ

[রবীন্দ্রসঙ্গীত]

১. খেলার সাথী বিদায় দ্বার খোলো

২. তুমি কিছু দিয়ে যাও -

রবীন্দ্রসঙ্গীতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব ঃ

বাল্যকালেই রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্য সুরের সহিত পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোয় নানা বিদেশী সুর বাজাইতেন রবীন্দ্রনাথ তাহাতে কথা বসাইতেন। ইহার পর কবি কৈশোরে বিলাত গমন করিলে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবেশে মানুষ হইয়াছেন যেখানে কোন দরজাই তাঁহার বন্ধ ছিল না। নিজের সঙ্গীত সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য কবি একদিকে যেমন ভারতীয় এবং দেশী সঙ্গীতের অনেক কিছুই গ্রহণ করিয়াছেন। তেমনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্য হইতে অনেক কিছুই আহরণ করিয়াছেন।

ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রস্মৃতির কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ

"প্রকৃতপক্ষে সজ্ঞানে আমাদের ভাইবোনের প্রথম পরিচয় হয় বিলাত প্রবাসে। সেখানে আমরা মায়ের সঙ্গে অনুমান ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিয়ে পৌঁছই, পরে বাবা ও রবিকাকা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আসেন। সেই সময় থেকেই বিলিতী সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং শুনেছি তাঁর সুরেলা জোরালো তারসপ্তকের চড়া গলা, যাকে ও দেশে বলে 'টেনর্', শুনে ওরা মুগ্ধ হত। সে বয়সে অবশ্য ইহার সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার ছিল না, কিন্তু এইটুকু মনে আছে যে,

'Won't you tell me, Molly darling'
'Darling, you are growing old'
'Good-bye, sweetheart, good-bye'

প্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি গাইতেন। আইরিশ কবি টমাস মুরের Irish Melodies তখন খুব থেকে লোকপ্রিয় হয়েছিল।

ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগমে লিখিয়াছেন :

কবি প্রথম জীবনে বিলাত প্রবাসে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, তাই তাঁর প্রথম দিককার গানে বা গীতিনাট্যে বিলেতী প্রভাব লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। যথা, 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় 'কালমৃগয়ায়'। 'কালী কালী বলো রে আজ' ইত্যাদি কালীবন্দনার সুর একেবারে সশরীরে একটি ইংরেজী গান থেকে তোলা, সে গানটি হচ্ছে Nancy Lee, এবং তাতে একজন নাবিক তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর গুণগান করছেন। কালমৃগয়ার অনেক গানই ইংরেজী বা স্কচ ও আইরিশ গানের সুর ভাঙা। Go where glory waits thee সুরটি Thomas Moorএর Irish Melodiesএর অন্তর্গত।"

ইহা ছাড়া বেন্ জন্সনের বিখ্যাত গান 'Drink to me only with thine eyes' ভাঙিয়া লিখিয়াছিলেন 'কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া।' বাল্মীকিপ্রতিভার 'মরি ও কাহার বাছা', মায়ার খেলার 'আহা আজি এ বসন্তে', এবং কালমৃগয়ার 'মানা না মানিলি'র সুর 'Go where glory' নামে একই আইরিশ মেলডি হইতে ভাঙা।

কালমৃগয়া ও বাল্মীকি প্রতিভা'র কতকগুলি গানে যে ইংরেজী স্কচ আইরিশ প্রভৃতি গানের সুর দেওয়া হইয়াছে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সংগম অনুযায়ী তাহার তালিকা দেওয়া হইল—

কালমৃগয়া

[রবীন্দ্রসঙ্গীত]	[মূল গান]
ও দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে :	The Vicar of Bray :
তুই আয় রে কাছে আয় :	The British Grenadiers :
ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে :	Ye banks and braes :
মানা না মানিলি :	Go where glory waits thee :
সকলই ফুরালো :	Robin Adair :

মায়ার খেলা

আহা, আজি এ বসন্তে :	Go where glory waits thee :

বাল্মীকিপ্রতিভা

তবে আয় সবে আয় :	অজ্ঞাত :
কালী কালী বলো রে আজ :	Nancy Lee :
মরি, ও কাহার বাছা :	Go where glory waits thee :

অন্য গান

ওহে দয়াময় :	Go where glory waits thee :
কতবার ভেবেছিনু :	Drink to me only :
পুরাণো সেই দিনের কথা :	Auld Lang Syne

তানপুরার বর্ণনা

ভারতীয় সঙ্গীতে সুরের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতে তানপুরা যন্ত্রটি ব্যবহার হইয়া থাকে। কথিত আছে তম্বরু মুনি নাকি এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। তম্বরু মুনির নামানুসারেই এই যন্ত্রটির নাম হইয়াছে তম্বুরা বা তানপুরা। তানপুরার প্রথমেই যে লম্বা দণ্ডটি দেখা যায়, ইহা কাঁঠাল, তুঁত বা সেগুন কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়। ইহার ভিতরটা ফাঁপা। দণ্ডের ঠিক নীচে লাউ নির্মিত গোলাকৃতি অংশকে **তুম্বা** বলা হয়। ইহারও ভিতরটা ফাঁপা। তুম্বার উপরে একটি পাতলা কাঠের ঢাকনা লাগান থাকে ইহাকে বলা হয় **তবলী**। তবলীর ঠিক মধ্যস্থলে একটি হাড় নির্মিত সেতুর মত দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে **ব্রীজ** বলা হয়। দণ্ড ও তুম্বার সংযোগ স্থলকে বলা হয় **গুলু** বা **কমর**। তুম্বার নীচের দিকে শেষপ্রান্তে চারিটি ছিদ্রযুক্ত একটি কাঠের খণ্ড লাগান থাকে, ইহাকে **মোগরা** বলা হয়। তুম্বার বিপরীত দিকে অর্থাৎ দণ্ডের মাথার দিকে

চারিটি কাঠের গোল টুকরা লাগান থাকে ইহাদের **কান** বা **খুঁটি** বলা হয়। তারের একপ্রান্ত মোগরাতে বাঁধা হয় ও অপর প্রান্ত খুঁটিতে জড়ান হয়। খুঁটিগুলির নীচে দুইটি হাড়ের টুকরা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের প্রথমটিকে বলা হয় **অটী** ও দ্বিতীয়টিকে বলা হয় **তারগহন**। তারগহনে চারিটি তারের সংখ্যানুযায়ী চারিটি ছিদ্র থাকে। তারগুলি তারগহনের ছিদ্রপথে অগ্রসর হইয়া খুঁটিতে পৌছায়। তানপুরার চারিটি তার থাকে। তার চারিটির প্রথমটি ষ্টীল অথবা পিতলের, দ্বিতীয়, তৃতীয়টি ষ্টীলের এবং চতুর্থটি পিতলের। ব্রীজের ঠিক নীচে চারিটি তারের প্রতিটিতে একটি করিয়া মোতি লাগান থাকে, ইহাদের **মনকা** বলা হয়। এই মনকা উপরে বা নীচে সরাইয়া যথাযথ স্বরে মিলাইতে সাহায্য করে। ব্রীজের উপরের সমতল ভাগকে বলা হয় জোয়ারী। ব্রীজের উপরে প্রতিটি তারের নীচে এক এক টুকরা সুতা লাগান থাকে। এই সুতা দ্বারা তানপুরার জোয়ারী ঠিক করা হয়।

তানপুরার সুর মিলাইবার নিয়ম

তানপুরার চারিটি তার থাকে। প্রথমে মধ্যবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় জুড়ীর তার দুইটিকে মধ্য সপ্তকের ষড়জে মিলাইতে হয়। চতুর্থ পিতলের মোটা তারটিকে মন্দ্র সপ্তকের ষড়জে মিলাইতে হয়। প্রথম তারটিকে রাগে ব্যবহৃত স্বর অনুসারে শুদ্ধ গান্ধার, শুদ্ধ মধ্যম, পঞ্চম বা শুদ্ধ নিষাদে মিলাইতে হয়। প্রথম তারটি পিতল অথবা ষ্টীলের হয়। ইহাকে সাধারণত পঞ্চমে মিলান হইয়া থাকে। তবে যে রাগে পঞ্চম বর্জিত সেক্ষেত্রে শুদ্ধ মধ্যমে মিলান হইয়া থাকে। তীব্র মধ্যমে কখনও তানপুরা মিলান হয় না। যে রাগে পঞ্চম ও শুদ্ধ মধ্যম উভয়ই বর্জিত সেক্ষেত্রে পিতলের তার হইলে শুদ্ধ গান্ধারে এবং ষ্টীলের তার হইলে শুদ্ধ নিষাদে মিলান হইয়া থাকে। তারগুলি মিলাইবার পর ব্রীজের উপরে তারের নীচেকার সুতার টুকরাগুলি প্রয়োজনমত সরাইয়া জোয়ারী ঠিক করিতে হয়। তানপুরার সুর মিলাইতে হইলে বিশেষ সুরবোধ থাকা প্রয়োজন। প্রথমে গুরুর নিকট তানপুরা মিলান শিক্ষা করা উচিত।

খোলের বর্ণনা

খোল অবনদ্ধ বাদ্যের অন্তর্গত। খোলের সম্পূর্ণ কাঠামোটি পোড়া মাটি দ্বারা তৈয়ারী হয়। ইহার দুই দিক ঢালু, মধ্যস্থলের পরিধি স্ফীত। বাম এবং দক্ষিণ দুইটি মুখ চামড়া দ্বারা ঢাকা থাকে এবং মধ্যভাগে গাব লাগান থাকে। দক্ষিণ মুখের তুলনায় বাম মুখটি আয়তনে বৃহত্তর। দুই মুখের চর্মাবরণ চামড়ার টানায় আঁটভাবে সংযুক্ত থাকে। খোলের দক্ষিণ মুখের পরিধি তিন হইতে চার ইঞ্চির বেশী হয় না এবং ইহার স্বর অতিতারার কোন স্বরে থাকে। ইহার বাম মুখটিতে অনেকটা বাঁয়ার মত শব্দ হয়। ইহার পরিধি সাত হইতে আট ইঞ্চি হইয়া থাকে। খোলের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কোন স্বর বাঁধিবার প্রয়োজন হয় না। বাংলাদেশে সাধারণত কীর্তন এবং কিছু ভক্তিগীতি খোল দ্বারা সঙ্গত করা হয়। কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতেও খোল ব্যবহারের রীতি আছে।

পখাবজ বা পাখোয়াজের বর্ণনা

"পাখোয়াজ" শব্দটির উৎপত্তি অনুমান নির্ভর। সম্ভবতঃ 'পক্ষ বাজ' শব্দ ইহার মূল। পক্ষ অর্থাৎ দুইটি বা একজোড়া, বাদ্য (বাজ) বা যাহাতে একজোড়া বাজ বা আওয়াজ পাওয়া যায় তাহাই পাখোয়াজ।

পাখোয়াজের দেহটি একটি মাত্র কাঠামোতেই আবদ্ধ। কাঠামোটি খয়ের বা রক্তচন্দন কাষ্ঠ দ্বারা নির্মিত হয়। ইহার ভিতরটা ফাঁকা। পাখোয়াজ ২৪ হইতে ২৬ ইঞ্চি লম্বা হয়। পাখোয়াজের দুইটি মুখ। বামদিকের মুখ অংশ বড় এবং ডানদিকের মুখ বামদিকের মুখ অপেক্ষা ছোট হয়। বামদিকের মুখ প্রায় নয় হইতে দশ ইঞ্চি চওড়া হয়। এবং ডানদিকের মুখ প্রায় সাত হইতে আট ইঞ্চি চওড়া হয়। বাঁয়া ও ডাহিনার মুখ যে চামড়া দ্বারা ঢাকা

থাকে তাহাকে **ছাউনি** বা **পুড়ী** বলা হয়। পুড়ীর চারিদিকে যে চামড়ার বিনুনী করা থাকে তাহাকে **পাগড়ী** বা **গজরা** বলা হয়। ডানদিকের পুড়ীর মাঝখানে **গাব** বা **স্যাহী** লাগান থাকে। বামদিকের পুড়ীর মাঝখানে স্যাহীর পরিবর্তে আটা লাগান হয়। ডাহিনার সহিত স্বরের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য বা আওয়াজ উঁচু বা নীচু করিবার জন্য আটার পরিমাণ বাড়ান ও কমান হয়। বাম ও ডানদিকের গজরার ভিতর দিয়া যে চামড়ার পট্টি লাগান থাকে ইহাকে **ছোট** বা **বদ্ধি** বলা হয়। এই বদ্ধি দ্বারা দুইদিকের পুড়ী কষা থাকে। বদ্ধিগুলির নীচে কাঠের কয়েকটি গোল টুকরা থাকে ইহাদের **গুলি** বা **গাট্টা** বলে। এই গাট্টাগুলি উভয়দিকে প্রয়োজনমত সরাইয়া পাখোয়াজের স্বর মিলান হয়।

তবলার বর্ণনা

ভারতীয় তালবাদ্যের মধ্যে তবলা প্রধান ও সর্বাধিক প্রচলিত। কথিত আছে আলাউদ্দিন খিলজীর দরবারের মহাজ্ঞানী, কবি, সঙ্গীতশিল্পী অমীর খসরু পাখোয়াজকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া তবলার সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তবলা বলিতে তবলা ও বাঁয়া দুইটিকে বুঝায়। তবলা ডান হাত দ্বারা বাজান ও বাঁয়া বাম হাত দ্বারা বাজান হয়।

তবলাঃ—তবলা সাধারণত আম, কাঁঠাল, নিম, শীষম, চন্দন প্রভৃতি কাঠের হইয়া থাকে। ইহার ভিতরটা ফাঁপা। আকৃতি গোল ও উচ্চতায় প্রায় এক ফুট হইয়া থাকে। ইহার মুখ পাঁচ হইতে ছয় ইঞ্চি চওড়া হইয়া থাকে। তবলার কাঠের উপরিভাগ যে চামড়া দ্বারা আবৃত থাকে তাহাকে **পুড়ী** বলা হয়। পুড়ীর ঠিক মধ্যস্থলে যে চন্দ্রাকার কালো মসলা লাগান থাকে ইহাকে **গাব** বা **স্যাহী** বলা হয়। পুড়ীর চারিদিকে প্রায় এক ইঞ্চি

চওড়া যে চামড়ার পাতলা পট্টি লাগান থাকে তাহাকে **কিনার** বা **চাঁটি** বলে। চাঁটি ও স্যাহীর মধ্যস্থলকে **লব** অথবা **ময়দান** বলা হয়। পুড়ীর চারিদিকে চামড়ার মালার মত যে বিনুনী করা থাকে তাহাকে **গজরা** বা **পাগড়ী** বলা হয়। তবলার নীচে আর একটি চামড়ার মালার মত দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে বলা হয় **গুড়রী**। গজরা বা গুড়রীর মধ্য দিয়া যে চামড়ার সরু পট্টি লাগান থাকে ইহাকে **ছোট** বা **বদ্ধি** বলা হয়। এই বদ্ধি দ্বারা পুড়ী কষা হয়। বদ্ধির মধ্যে দুই ইঞ্চি লম্বা কাঠের যে আটটি গোল টুকরা লাগান থাকে তাহাদের **গুলি** বা **গাট্টা** বলা হয়। এই গাট্টাগুলি তবলার সুর মিলাইতে সাহায্য করে।

বাঁয়া ঃ—বাঁয়া মাটি বা তামা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ভিতরটা ফাঁপা আকৃতি গোল ও উচ্চতায় ১০ ইঞ্চি হইয়া থাকে। যে চামড়া দ্বারা বাঁয়ার মুখ ঢাকা থাকে তাহাকে **পুড়ী** বলা হয়। বাঁয়ার পুড়ীর উপরে যে চন্দ্রাকার কালো মসলা লাগান থাকে তাহাকে **স্যাহী** বা **গাব** বলা হয়। বাঁয়ার পুড়ীর চারিদিকে তবলার মত চামড়ার যে বিনুনী করা থাকে তাহাকে **গজরা** বা **পাগড়ী** বলা হয়। বাঁয়ার পুড়ীর চারিদিকে যে এক ইঞ্চি চামড়ার পট্টি লাগান থাকে তাহাকে **চাঁটি** বলে। চাঁটি ও স্যাহীর মধ্যস্থলকে **লব** বা **ময়দান** বলা হয়। বাঁয়ার নীচে একটি চামড়ার মালার মত দেখিতে পাওয়া যায় ইহাকে বলা হয় **গজরা**। বাঁয়ার পুড়ী কষিবার জন্য কোন কোন বাঁয়াতে পিতলের আংটির মত ডোরি লাগান থাকে, আবার কোন কোন বাঁয়াতে চামড়ার বদ্ধি লাগান থাকে। তবলা ও বাঁয়া পাশাপাশি রাখিয়া বাজাইতে হয়।

বিষ্ণু চক্রবর্তী

বিষ্ণু চক্রবর্তী ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক এবং গুরুদেবের পরিবারের সঙ্গীত শিক্ষক। ইনি শিশুদের কাঁধের উপর তম্বুরা তুলিয়া গান অভ্যাস করাইয়াছেন। কর্তাদের নির্দেশমত বাঙলা ছড়ায় রাগরাগিণী বসাইয়া সহজ তালে গান শিখাইতেন। ইহাতে আরম্ভে সা রে গা মা ইত্যাদির নীরস অভ্যাসে গানের প্রতি শিশুদের মন বিমুখ হইত না। এই বিষ্ণুই ছিলেন গুরুদেবের সঙ্গীত জীবনে প্রথম সঙ্গীতগুরু। ইঁহারই নিকট গুরুদেবের ভারতীয় সঙ্গীতে প্রথম হাতে ঘড়ি হয়। এই গায়কের গানে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের সত্যিকার একজন রসিক ছিলেন। ঠাকুর পরিবারে অন্যান্য ওস্তাদের গান অপেক্ষা বিষ্ণুর গানই সকলে বেশী পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। অন্যান্য ওস্তাদগণ যেমন তান অলঙ্কারের প্রাধান্য দিতেন বিষ্ণু তেমন করিতেন না। তিনি অল্প তান প্রয়োগ করিলেও তাহাতে রাগরাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন না। ইহা ছাড়া কথার যে একটা মূল্য আছে তাহা বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। বিষ্ণু ধ্রুপদ-খেয়াল গানই বেশী গাহিতেন।

গুরুদেব শৈশবে কীভাবে তাঁহার নিকট গান শিখিতেন তাহার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—একজন বড় ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়কের পক্ষে কীভাবে সাধারণ চলতি গ্রাম্য ভাষার ছড়াকে মার্গসঙ্গীতপন্থী বৃদ্ধ গায়ক বিনা দ্বিধায় গাহিয়া শিখাইয়াছেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

রামমোহন রায়ের সময় হইতে বিষ্ণু ক্রমান্বয়ে একাধিক্রমে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ছিলেন। তাহার পর বার্ধক্য হেতু অবসর গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও অনেক প্রকারের হিন্দী ও বাঙলা গান রচনা করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে থিয়েটারি গানে সুর দিতেন এবং নিজেও অন্তরাল হইতে গাহিতেন। তখনকার দিনে থিয়েটারের জন্য

ঐক্যতান বাদনের গত তাঁহাকেই রচনা করিতে হইত। তাঁহার কণ্ঠের গানে ব্রাহ্মসমাজের শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইতেন। তাই তাঁহার অবসর গ্রহণকালে আদি সমাজের একজন ভদ্র শ্রোতা লিখিয়াছিলেন: "অতপর ব্রাহ্মরা এইরূপ মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত আর শুনিতে পাইবেন কিনা সন্দেহ। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহই নাই বিষ্ণুর সঙ্গীতে যাঁহার অশ্রুপাত না হইয়াছে। বহুদিনের পর ব্রাহ্মসমাজে গায়কের একটি অভাব উপস্থিত হইল। পূবণ হইবে কি না কে জানে।"

আদি ব্রাহ্ম সমাজের এই সুবিখ্যাত ধ্রুপদ-খেয়াল গানের সুকণ্ঠ গায়ক ১৯০০ সালের ৫ ই মে তারিখে ৯৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র। ইঁহার পিতা দ্বিপেন্দ্রনাথ ও মাতা সুশীলা দেবী সঙ্গীতে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ বাল্যকালে 'লরেটো কনভেণ্টে' পড়াশুনা করেন। পাঠ্যাবস্থাতেই পিয়ানো বাজনায় দক্ষতা অর্জন করেন। অতঃপর বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতে গিয়া নিয়মিত চর্চা করিয়া য়ুরোপীয় সঙ্গীতেও পারদর্শিতা লাভ করেন।

দিনেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই শ্রুতিধর ছিলেন। তিনি নূতন সুর শুনিবামাত্রই নির্ভুলভাবে কণ্ঠে তুলিয়া লইতে পারিতেন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রায় সব সময় তাঁহার কাছে কাছে রাখিতেন। রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে "সকল নাটের কাণ্ডারী আমার সকল গানের ভাণ্ডারী" বলিয়া উল্লেখ করেন।

দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন কাব্যানুরাগী এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক ও প্রচারক। আমৃত্যু রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধারক বাহকরূপে তিনি সঙ্গীত

সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ স্বরলিপিকার। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সাত শত গানের স্বরলিপি তিনিই প্রস্তুত করেন। কবিতা ও গান রচনায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। তাঁহার স্বরচিত গানগুলি অভিনবত্বে এবং সবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। দিনেন্দ্র রচনাবলীতে তাঁহার কয়েকটি রচনা এবং গান স্বরলিপি সহ সংকলিত হইয়াছে।

সঙ্গীত শিক্ষকরূপে তাঁহার ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, অনাদিকুমার দস্তিদার প্রমুখ রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞগণ সকলেই তাঁহারই শিষ্য। তিনি নিজেও একজন আসাধারণ গায়ক ছিলেন। ভারতীয় রাগসঙ্গীতে এবং বেশ কয়েকটি যন্ত্রে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। নাট্যকলা ও আবৃত্তি সমান দক্ষতার সহিত করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় বাল্মীকি ও প্রথম দস্যু, 'অচলায়তন' এ পঞ্চক, 'বিসর্জন' এ রঘুপতির ভূমিকায় অসামান্য অভিনয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে দিনেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সঙ্গীত বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পণ্ডিত ভীমসেন রাও শাস্ত্রী অধক্ষ্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিশ্বভারতী সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন দিনেন্দ্রনাথ। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে দিনেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর কাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে উঠিয়া যান। এখানেই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

॥ তৃতীয়-বর্ষ ॥

অলঙ্কার

১. সরসগা রগরমা গমগপা মপমধা পধপনা ধনধর্সা
র্সনর্সধা নধনপা ধপধমা পমপগা মগমরা গরগসা।

২. সগরগা রমগমা গপমপা মধপধা পনধনা ধর্সনর্সা
র্সধনধা নপধপা ধমপমা পগমগা মরগরা গসরসা।

৩. সরগ,গরসা রগম,মগরা গমপ,পমগ মপধ,ধপমা পধন,নধপা ধনর্স,র্সনধা ।
র্সনধ,ধনর্সা নধপ,পধনা ধপম,মপধ পমগ,গমপা মগর,রগমা গরস,সরগা।

৪. সর,সমগরা রগ,রপমগা গম,গধপমা মপ,মনধপা পধ,পর্সনধা
র্সন,র্সপধনা নধ,নমপধা ধপ,ধগমপা পম,পরগমা মগ,মসরগা।

৫. সরগ,সরগমা রগম,রগমপা গমপ,গমপধা মপধ,মপধনা পধন,পধনর্সা
র্সনধ,র্সনধপা নধপ,নধপমা ধপম,ধপমগা পমগ,পমগরা মগর,মগরসা।

৬. সগরগ,সরগমা রমগম,রগমপা গপমপ,গমপধা মধপধ,মপধনা পনধন,পধনর্সা
র্সধনধ,র্সনধপা নপধপ,নধপমা ধমধপ,ধপমগা পগপম,পমগরা মরগর,মগরসা

৭. সসরর,সসররগমাররগগ,ররগগমপা গগমম,গগমমপধা মমপপ,মমপপধনা
পপধধ,পপধধনর্সা
র্সর্সনন,র্সর্সননধপা ননধধ,ননধধপমা ধধপপ,ধধপপমগা পপমম,পপমমগরা
মমগগ,মমগগরসা।

রাগ-ভৈরবী : পরিচয়

এই রাগ ভৈরবী ঠাটের অন্তর্গত। ইহা ভৈরবী ঠাটের আশ্রয়রাগ। ইহাতে ঋা জ্ঞা দা ণা কোমল ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ

জাতি। মা বাদী ও সা সমবাদী। গাহিবার সময় প্রাতঃকাল। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। এই রাগে সাধারণত ঠুংরী গাওয়া হয়। প্রকৃতি চঞ্চল।

আরোহ: সা ঋা জ্ঞা মা পা দা ণা র্সা

অবরোহ: র্সা ণা দা পা মা জ্ঞা ঋা সা

পকড়: মা জ্ঞা, সা ঋা সা, দ্‌া ণ্‌া সা।

রাগ-পূর্বী : পরিচয়

এই রাগ পূর্বী ঠাটের অন্তর্গত। ইহা পূর্বী ঠাটের আশ্রয়রাগ। ইহাতে ঋা দা কোমল, হ্মা তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। গা বাদী ও না সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা শেষ প্রহর। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ।

আরোহ: সা ঋা গা, হ্মা পা, দা, না র্সা

অবরোহ: র্সা না দা পা, হ্মা গা, ঋা সা

পকড়: ন্‌া, সা ঋা গা, মা গা, হ্মা গা, ঋা গা, ঋা সা।

রাগ-তোড়ী : পরিচয়

এই রাগ তোড়ী ঠাটের অন্তর্গত। ইহা তোড়ী ঠাটের আশ্রয়রাগ। ইহাতে ঋা জ্ঞা দা কোমল, হ্মা তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। আরোহ অবরোহতে সাতটি স্বরই ব্যবহার হয়। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতি। দা বাদী ও জ্ঞা সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহর। উত্তরাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর।

আরোহ: সা, ঋা জ্ঞা হ্মা পা, দা না র্সা

অবরোহ: র্সা না দা পা, হ্মা জ্ঞা, ঋা সা

পকড়: দ্‌া ন্‌া সা, ঋা জ্ঞা, ঋা সা, হ্মা জ্ঞা, ঋা জ্ঞা ঋা সা।

রাগ-কেদার : পরিচয়

এই রাগ কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে উভয় মধ্যম (মা হ্মা) ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। অবরোহতে অল্প কোমল 'ণা' মাঝে মাঝে বিবাদী স্বররূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আরোহতে রা গা বর্জিত ও অবরোহতে গ বক্র ও দুর্বল। ঔড়ব—খাড়ব জাতি। মা বাদী সা সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি শান্ত।

আরোহ : সা মা, মা পা, ধা পা, না ধা র্সা

অবরোহ : র্সা, না ধা, পা, হ্মা পা ধা পা, মা, রা সা

পকড় : সা মা, মা পা, ধা পা মা, পা মা, রা সা।

পর্যায় : পূজা

১.	তোমার পূজার ছলে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪১
২.	অরূপবীণা রূপের আড়ালে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪২
৩.	বিপদে মোরে রক্ষা করো	তাল ঝম্পক	স্বরবিতান ২৫
৪.	চিরবন্ধু, চিরনির্ভর, চিরশান্তি	তাল ষষ্ঠী	স্বরবিতান ২৭
৫.	মহাবিশ্বে মহাকাশে	তাল তেওরা	স্বরবিতান ৪
৬.	কী গাব আমি কী শুনাব	তাল একতাল	স্বরবিতান ৪
৭.	নিবিড় ঘন আঁধারে	তাল নবতাল	স্বরবিতান ৪
৮.	প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী	তাল ঝাঁপতাল	স্বরবিতান ২৪
৯.	আঁখিজল মুছাইলে, জননী	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ২৪
১০.	গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে	তাল রূপকড়া	স্বরবিতান ৪

পর্যায় : প্রেম

১.	আমি চিনি গো চিনি	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৫০
২.	সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১
৩.	তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা	তাল একতাল	স্বরবিতান ১০

৪.	ঘরেতে ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১২
৫.	চপল তব নবীন আঁখি দুটি	তাল ঝম্পক	স্বরবিতান ৩
৬.	ওগো আমার চির অচেনা	তাল ঝাঁপতাল	স্বরবিতান ৫৯
৭.	যদি বারণ করো	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ১০
৮.	আমার যাবার বেলায়	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৩১
৯.	মনে রবে কিনা রবে আমারে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ২
১০.	মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫৮

পর্যায় : প্রকৃতি

১.	মধ্যদিনে যবে গান	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ২
২.	এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৫
৩.	মোর ভাবনারে কী হাওয়ায়	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ৫৮
৪.	আজি ঝড়ের রাতে	তাল ঝম্পক	স্বরবিতান ১১
৫.	একটুকু ছোঁওয়া লাগে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩
৬.	আজি বর্ষারাতের শেষে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১৫
৭.	ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৫
৮.	আজ আকাশের মনের কথা	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৫
৯.	বাদল মেঘে মাদল বাজে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৪
১০.	শরৎ আলোর কমলবনে	তাল রূপকড়া	স্বরবিতান ৫০

পর্যায় : স্বদেশ

১.	নিশিদিন ভরসা রাখিস	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪৬
২.	এবার তোর মরা গাঙে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪৬
৩.	ওরে নূতন যুগের ভোরে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪৭
৪.	বাংলার মাটি, বাংলার জল	তাল একতাল	স্বরবিতান ৪৬
৫.	আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪৬

পর্যায় : আনুষ্ঠানিক

১.	এসো এসো প্রাণের উৎসবে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১
২.	আয়রে মোরা ফসল কাটি	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩০
৩.	সম্মুখে শান্তি পারাবার	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫২

পর্যায় : বিচিত্র

১.	দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১
২.	আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩০
৩.	পরবাসী চলে এসো ঘরে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১

একতাল : ১২ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

২´ ৩ ০ ১
I ধিন ধিন না । তেটে ধিন না । কৎ তে ধাগে । তেটে ধিন তেটে I

পরিচয়

এই তালের ১২টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। প্রতি বিভাগে তিনটি করিয়া মাত্রা আছে। ইহার তিনটি তাল ও একটি ফাঁক। প্রথম, চতুর্থ ও দশম মাত্রায় তাল ও সপ্তম মাত্রায় ফাঁক।

একতালের দ্বিগুণ

২´ ৩
I ধিনধিন নাতেটে ধিনদা । কৎতে ধাগেতেটে ধিনতেটে ।

০ ১
ধিনধিন নাতেটে ধিনদা । কৎতে ধাগেতেটে ধিনতেটে I

নবতাল ঃ ৯ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

	১´		২		৩		৪	
I	ধা দেন তা	।	তেটে কতা	।	গদি ঘেনে	।	ধাগে তেটে	I

পরিচয়

এই তালটি রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত। এই তালের ৯টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে তিনটি ও অপর তিনটি বিভাগে তুইটি করিয়া মাত্রা আছে। চারিটিই তাল। কোন ফাঁক নাই।

নবতালের দ্বিগুণ

	১´		২	
I	ধাদেন তাতেটে কতাগদি	।	ঘেনেধাগে তেটেধা	।
	৩		৪	
	দেনতা তেটেকতা	।	গদিঘেনে ধাগেতেটে	I

॥ সাঙ্গীতিক পরিভাষা ॥

কাব্য সঙ্গীত

সুর অপেক্ষা কথার প্রাধান্য যেখানে বেশী এবং রচনার মধ্যে কাব্যগুণ বর্তমান তাহাকেই কাব্য সঙ্গীত বলা হয়। কাব্যসঙ্গীতে বাণী ও সুরের হয় হর-গৌরী মিলন। এই সঙ্গীতে সুর অপেক্ষা কাব্যের প্রাধান্য বেশী থাকে। কাব্যসঙ্গীতে কাব্যের মধ্য দিয়া আমাদের অনুভূতির বিকাশ ঘটে সেই কারণে এখানে কাব্যই মুখ্য। বাংলা সাহিত্যের বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, কালমৃগয়া, এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের বেলাড্ (Ballad) বা গাথা-কাব্য কাব্য-সঙ্গীতের উদাহরণ।

লোকসঙ্গীত

গ্রাম্যজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পূজা, পার্বণ, উৎসবে, লৌকিক গার্হস্থ্য আচার অনুষ্ঠানে যে সকল গীত পরিবেশিত হয় তাহাদেরই লোকসঙ্গীত বলা হয়। লোকগীতি গাহিয়াই এ দেশে কৃষক হল চালনা করে, মাঝি নদীতে নৌকা বাহিয়া যায়, রাখাল পশু চরায়, ভিক্ষুক ভিক্ষা করে, ধর্মীয় এবং পারিবারিক আনন্দোৎসবে রমণীরা মাঙ্গলিকী গাহে, সাধু সন্তেরা সাধন ভজন করেন।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে সঙ্গীতকে মার্গ এবং দেশী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত। মার্গ সঙ্গীত ছিল দেবলোকের সামগ্রী আর দেশী সঙ্গীত ছিল মর্তদেশে মানবহৃদয়রঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত। অধুনা যাহাকে লোকসঙ্গীত বলা হয়, তাহা সঙ্গীত শাস্ত্রোল্লিখিত দেশী সঙ্গীতের প্রকারভেদ। এই সঙ্গীতে শাস্ত্র ও ব্যাকরণের শাসন থাকে না, কিছু পরিমাণ থাকিলেও তাহা অতি শিথিলভাবে প্রযুক্ত হয়। লোকসঙ্গীতের সুর ও তাল বিশেষভাবেই জটিলতা-মুক্ত সরল প্রকৃতির। মানব মনের আনন্দ বেদনার স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত অভিব্যক্তি এই সঙ্গীতের উৎস বলিয়া ইহার ভাব ও ভাষা যেমন চেষ্টাকৃত অলঙ্কার বর্জিত হয়, সুর এবং তাল ও তেমনি সুদীর্ঘকালের অভ্যাসজনিত শিক্ষিত পটুত্বের অপেক্ষা রাখে না। চমকপ্রদ কলাকৌশলের অবকাশ লোকসঙ্গীতে থাকে না। কৃত্রিম নগরজীবন হইতে দূরে উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার পরিবেশে গ্রামাঞ্চলে লোকসঙ্গীতের উদ্ভব ও বিকাশ হয়।

ভাবসঙ্গীত

ভাবসঙ্গীতে সাধক গায়কের অন্তরস্থিত ভাব প্রকাশই মুখ্য। সুর এক্ষেত্রে ভাবপ্রকাশের সহায়কমাত্র। এই সঙ্গীত সাধারণ মানুষের আমোদ প্রমোদের জন্য নহে। ইহা আধ্যাত্মসাধনার এবং সাধকের অন্তরস্থিত ভক্তি প্রকাশের সহায়ক। ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি ভাবসঙ্গীতের উদাহরণ।

বাউল

বাংলাদেশের এক বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায় বাউল নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায় আপনাদের সাধন ভজনের অঙ্গ হিসাবে যে সকল গান রচনা করে তাহা বাউল গান নামে অভিহিত হয়। গানগুলি দেহতত্ত্ব বিষয়ক। বাউলেরা জীবন সাধনাকে প্রেমের সাধনারূপে গ্রহণ করে। তাহারা প্রচলিত সামাজিক রীতিমুক্ত অনেকটা যাযাবর সম্প্রদায়ের মত জীবনযাপন করে। তাহারা যেন সর্বদাই এক ভাবের ঘোরে জীবন কাটায়। বাউল গানের ভাষা একটু হেয়ালীপূর্ণ হয়।

বাংলার বাউলদের সাধনা 'অধর মানুষ'কে ধরিবার বিশেষ সাধনা। তাহারা মনে করে যে, দেহকে অবলম্বন করিয়াই, কামের মধ্য দিয়াই প্রেমে উত্তীর্ণ হইতে হয়। বাংলার বাউল সমাজে সিদ্ধ পুরুষ লালন ফকিরের একটি গান আছে—

বলবো কি সে প্রেমের কথা, কাম হইল প্রেমের লতা।
কাম ছাড়া প্রেম যথা তথা, নাইরে আগমন ॥

বাউলের পায়ে থাকে ঘুঙুর, কোমরে বাঁধা থাকে বাঁয়া ও ডানহাতে থাকে একতারা। সহজ সরল নাচের তালে তালে হয় বাউল গানের পরিবেশন—

অধর ধর আমার মন।
তোর ভাবগঙ্গা দূরে যাবে ওরে তুই এড়াবি শমন।

গ্রাম

গ্রাম বলিতে সাতটি স্বরের সমাহারকে বুঝায়। প্রাচীনকালে বাইশটি শ্রুতির ভিত্তিতে সাতটি শুদ্ধ স্বরকে স্থাপনা করিয়া সেই স্বরসমষ্টিকে গ্রাম আখ্যা দেওয়া হইত। গ্রামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতঙ্গ লিখিয়াছেন—

"সাম বেদাৎ স্বরাজাতাঃ স্বরেভ্যো গ্রাম সম্ভবঃ।"

সামবেদ হইতে স্বরের এবং স্বরসমূহ হইতে গ্রাম এর উদ্ভব হইয়াছে। গ্রামের

সংখ্যা সম্বন্ধে অবশ্য প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। 'ভরত নাট্যশাস্ত্রে' দুইটি গ্রামের উল্লেখ আছে—দ্বোগ্রামৌ ষড়জো মধ্যমশ্চেতি। 'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থে অহোবল তিনটি গ্রামের উল্লেখ করিলেও ষড়জ গ্রামকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন—"অথ গ্রামাস্ত্রয়ং প্রোক্তাঃ"। গ্রাম হইল মূর্চ্ছনার ভিত্তি বা আশ্রয়।

মূর্চ্ছনা

সাতটি স্বরের আরোহ অবরোহের ক্রমকে মূর্চ্ছনা বলা হয়। তিনটি গ্রামে প্রত্যেকটিতে সাতটি করিয়া মূর্চ্ছনার সংখ্যা হইল একুশ। সাতটি শুদ্ধ স্বর এবং শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর মিলিয়া বারোটি স্বর দ্বারাও মূর্চ্ছনা রচিত হইতে পারে। সাত স্বর দ্বারা রচিত মূর্চ্ছনা চারি প্রকার—পূর্ণ, ষাড়ব, ঔড়ব এবং সাধারণা (অন্তর গান্ধার ও কাকলী নিষাদযুক্ত)। বর্তমানকালে যেমন বলা হয় যে, ঠাট হইতে 'রাগ'-এর জন্ম তেমনি প্রাচীনকালে বলা হইত যে মূর্চ্ছনা হইতে 'জাতি'র উদ্ভব হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসের মধ্যযুগে মূর্চ্ছনা শব্দটির অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়। কোন রাগের বিস্তারকালে যে প্রথম তানটি গ্রহ স্বর হইতে আরম্ভ করা হইত, মধ্যযুগে তাহাকেই মূর্চ্ছনা বলা হইত। আধুনিককালে 'সা' সকল রাগের গ্রহ স্বর হইবার ফলে মূর্চ্ছনা ও আরোহ অবরোহ এক হইয়া গিয়াছে। আধুনিক কর্ণাটী সঙ্গীতে আরোহ অবরোহকেই মূর্চ্ছনা বলা হয়।

তান

রাগে ব্যবহৃত স্বরসমূহের বিভিন্ন রচনাকে দ্রুতগতিতে গাহিলে বা বাজাইলে তাহাকে তান কহে। তান বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন: শুদ্ধতান, কূটতান, মিশ্রতান, বক্রতান, সপাট তান ইত্যাদি।

ছন্দ

পদ রচনার বিশিষ্ট পদ্ধতিকে ছন্দ বলে। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'কবিতায় যেটা ছন্দ, সঙ্গীতে সেইটি লয়।' পদ বা পদাংশের অক্ষর (Syllable) ও মাত্রা

বিন্যাসের বিশিষ্ট রীতি হইতেই ছন্দের উদ্ভব হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দ তিন প্রকার: অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মাত্রা ও লয়ভেদে ছন্দের উৎপত্তি হয়। তালের সাহায্যে সঙ্গীতের ছন্দকে প্রকাশ করা হয়। সঙ্গীতে তাল বা ছন্দ রক্ষার দুইটি কারণ—প্রথমটি সঙ্গীতের অবাধ গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ও দ্বিতীয়টি সঙ্গীতকে অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর করিবার জন্য।

লয়

লয় অর্থে সময়ের সমান গতি বা সমতা রক্ষা। গীত, বাদ্য ও সহযোগী তবলা ও মৃদঙ্গের নির্দিষ্ট গতি নির্ণয়ে এবং উভয়ের সমন্বয়ে যে মাধুর্য সৃষ্টি করে তাহাকে সঙ্গীতে **লয়** কহে। লয় তিন প্রকার যথা: **বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত।**

রাগ ও ঠাটের তুলনা

রাগ	ঠাট
[১] মনোরঞ্জনকারী স্বরবিস্তার ও স্বরসমূহকে রাগ বলা হয়।	[১] রাগ উৎপাদনে সমর্থ বিশিষ্ট স্বর রচনাকে ঠাট বলা হয়।
[২] রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলি ক্রমানুসারে সাজাইবার প্রয়োজন হয় না।	[২] ঠাটে ব্যবহৃত স্বরগুলি ক্রমানুসারে সাজাইবার প্রয়োজন হয়।
[৩] সাতটি, ছয়টি ও পাঁচটি স্বর দ্বারাও রাগ রচিত হয়।	[৩] সাতটি স্বরের নীচে ঠাট রচিত হয় না।
[৪] রাগে কোন স্বর বর্জিত থাকিলেও মাও পা একসঙ্গে বর্জিত হয় না।	[৪] ঠাটে কোন স্বর বর্জিত হয় না। সাতটি স্বর অবশ্যই লাগিবে।
[৫] রাগের মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতা আছে।	[৫] ঠাটের মনোরঞ্জন করিবার ক্ষমতা নাই।
[৬] রাগে রঞ্জকতার প্রয়োজন আছে।	[৬] ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন নাই।
[৭] রাগের আরোহ অবরোহ উভয়ই আছে এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে গাওয়া যায়।	[৭] ঠাটে কেবল আরোহ আছে অবরোহ নাই। আরোহে ব্যবহৃত স্বরগুলি কথঞ্চিৎ গাওয়া হয়।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত

প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য ঋষিগণ সঙ্গীতের জন্য বিশেষ কতকগুলি বিধিনিয়মের প্রবর্তন করেন। এই নিয়মে সঙ্গীতের উপযোগী সপ্ত স্বরের প্রয়োগ বিন্যাসরীতি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ভরত মতঙ্গ, দত্তিল প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্রীগণের রচিত গ্রন্থসমূহে সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনের যে বিশিষ্ট নিয়ম ও রীতি বর্ণিত হইয়াছে, যাহার অনুসরণে বর্তমানে আমরা ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীত পরিবেশিত হইতে শুনি তাহাকেই সাধারণ ভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বলা হয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে স্বরগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 'গ্রাম' এ বিন্যস্ত করা হয় এবং স্বরবিন্যাসের বিশিষ্ট কৌশলে কয়েকটি ঠাট বা রাগের কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। তাল, মান এবং লয় এই তিনের প্রয়োগ এবং ইহাদের সমন্বিত পরিবেশন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।

দেশী সঙ্গীত

"দেশী সঙ্গীতের" পরিচয় দিয়া মতঙ্গ লিখিয়াছেন—

অবলাবালগোপালৈঃ ক্ষিতিপালৈর্নিজেচ্ছয়া।
গীয়তে সানুরাগেণ স্বদেশে দেশিরুচ্যতে॥

স্ত্রীলোক, বালক, পশুপালক এমন কি ভূপতিও নিজের ইচ্ছায় (স্বেচ্ছায়) অনুরাগের সহিত স্বদেশে অর্থাৎ নিজ নিজ আবাসে যে গান গায় তাহাকে দেশী সঙ্গীত বলা হয়। লোকের চিত্তবিনোদনের জন্য স্থানীয় রীতি অনুযায়ী যে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তাহাই দেশী।

টীকাকার কল্লিনাথ দেশী সঙ্গীতকে বলিয়াছেন—কামচার প্রবর্তিতম্। যাহার যেরূপ রুচি সে সেইভাবেই গান করে। আঞ্চলিকতা দেশী সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। মার্গ সঙ্গীত যেমন দেবলোকের' দেশী সঙ্গীত তেমন বিশেষ করিয়া মর্তলোকের। দেশী সঙ্গীতে মার্গ সঙ্গীতের ন্যায় বিধিবদ্ধ আলাপ, মূর্চ্ছনা, তান, লয় ইত্যাদির সমাবেশ থাকে না। মার্গ সঙ্গীত যেমন নিয়মের অধীন, দেশী সঙ্গীত তেমনি শাস্ত্রীয় নিয়মের শাসনমুক্ত। শ্রোতার মনোরঞ্জনই দেশী সঙ্গীতের প্রধান লক্ষ্য।

॥ গীতিনাট্য সম্বন্ধে আলোচনা ॥

॥ গীতিনাট্য বাল্মীকি-প্রতিভা ।

বাল্মীকি-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্য রচনা। ইহার রচনাকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ। বিদ্বজ্জনসমাগম সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার অভিনয় হয়। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সন্নিবেশ দ্বারা রবীন্দ্রনাথ ইহাকে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে পাত্র-পাত্রীর মুখে কোনো গদ্য বা পদ্য সংলাপ যোজনা করা হয় নাই উহাদের বক্তব্য কেবল নানা সুরের গানকে অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। সমস্ত নাটকের বিষয়বস্তু কেবল সুরের মাধ্যমেই ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা নানা সুরের ফুল দিয়া গাঁথা একখানি সুদীর্ঘ সুরের মালা। রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, ইহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।"

এই প্রকার সুরের দ্বারা নাটকের কথাবস্তু অভিনয়ের সম্ভাবনার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ হার্বার্ট স্পেন্সরের The Origin and Function of Music নামক সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ হইতে পাইয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন—

"হার্বার্ট স্পেন্সরের একটা লেখার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে সচরাচর কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু-না-কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত, রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বিস্ময়, আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না—কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুসঙ্গিক

সুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষ সঙ্গীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন? আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেষ্টা আছে; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে সুরকে আশ্রয় করে, অথচ তাহা তালমান-সঙ্গত রীতিমতো সঙ্গীত নহে। ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ-ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই—একটা লয়ের মাত্রা আছে,—ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা—কোনো বিশেষ রাগিণী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, তবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতাদিগকে দুঃখ দেয় না।" "বাল্মীকি-প্রতিভার অনেক-গুলি গান বৈঠকি-গান-ভাঙা, অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো এবং গুটি তিনেক গান বিলাতী সুর হইতে লওয়া।" (জীবনস্মৃতি)

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হইলেও গীতিনাট্য বাল্মীকি-প্রতিভার বিষয়বস্তুতে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ নাট্য রচনার সুবিধার্থে যোগ করা হইয়াছে। দস্যু রত্নাকর হইতে বাল্মীকি রূপান্তরের বর্ণনাই এই নাট্যের প্রধান উপজীব্য। এই বর্ণনায় নেপথ্যে বনদেবীগণও সহকারিতা করিয়াছেন।

বাল্মীকি-প্রতিভার আখ্যানবস্তু

* প্রথম দৃশ্য *

দস্যুদলের উৎপাতে বনভূমির শান্তি বিঘ্নিত। দলের প্রথম দস্যু লাঠা-লাঠি কাটাকাটিতে পিছিয়ে থাকে কিন্তু লুটের দ্রব্য ভাগের সময় আগাইয়া আসে। তাহা হইলেও তাহারা সকলে এক ডোরে বাঁধা, বারণ-শাসন মানে না, রাজা-প্রজা গণ্য করে না। দস্যু দলপতি বাল্মীকি। দস্যুদল দলপতি বাল্মীকির

নিকট পরবর্তী করণীয় কাজের নির্দেশ চায়। এক অমাবস্যা রাত্রে কালীপূজার বলি আনিবার জন্য দলপতি নির্দেশ দিলেন। সুরাপানে মত্ত হইয়া শ্যামা মায়ের গান গাহিতে গাহিতে দস্যুরা গমনোদ্যত, এমন সময় অরণ্যে পথভ্রান্ত একটি বালিকা উপস্থিত হইল। বলির প্রাপ্তিযোগ হওয়ায় দস্যুগণ উল্লসিত। বালিকা বন্দিনী হইল। তাহার দুর্দশা দেখিয়া বনদেবীগণ হা-হুতাশ করেন।

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

অরণ্যে কালী প্রতিমার সম্মুখে বাল্মীকি স্তবে আসীন। সোৎসাহে দস্যুদল বালিকাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। বলির উদ্দেশ্যে বাল্মীকি কৃপাণ লইয়া আসিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু পথভ্রান্ত, একাকিনী, অসহায়া বন্ধন-কাতরা বালিকার আকৃতিতে বাল্মীকির পাষাণ হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। দলপতি অন্য বলি লইয়া আসিবার আদেশ দিলেন। এই আদেশে দস্যুদল আপত্তি জানাইল। বাল্মীকি তখন কৃপাণ খর্পর ফেলিয়া দিয়া বালিকাকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য দৃঢ় আদেশ দিলেন।

* তৃতীয় দৃশ্য *

অরণ্যে বাল্মীকি ব্যাকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার দস্যু মনোভাবের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু দস্যুগণ হাতের শিকার বালিকাকে ছাড়িতে চাহে না। তাহারা পুনবায় বালিকাকে ধরিয়া আনিয়া নিজেরাই কালীপূজার আয়োজন করিতে লাগিল। নিষেধ সত্বেও দস্যুগণের এই আস্পর্ধা দেখিয়া বাল্মীকি তাহাদের পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন এবং বালিকাকে মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি অভয় দিলেন।

* চতুর্থ দৃশ্য *

মনোভাব পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে বাল্মীকি মনে কোন শান্তি পাইতেছেন না। শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা দস্যুদলকে আহ্বান করিয়া শিকারে যাইবার আদেশ দিলেন। প্রথম দস্যু তাহার স্বভাবসুলভ রীতি অনুযায়ী শিকার হইতে দূরে থাকিতে চায়। দুইটি হরিণ শাবক দেখিয়া তাহারা শিকার করিবার জন্য

তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাহা দেখিয়া বাল্মীকি নিষেধাজ্ঞা দিলেন। দস্যুগণ বিরক্ত হইয়া বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

*** পঞ্চম দৃশ্য ***

দল-কতৃক পরিত্যক্ত হইয়া বাল্মীকি শূন্যহৃদয়ে একাকী বনে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, ব্যাধগণ ক্রৌঞ্চযুগলকে শিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। বাল্মীকির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা একটি ক্রৌঞ্চকে বধ কবিল। তখন বাল্মীকির কণ্ঠে উচ্চারিত হইল ঃ

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

নিজের কণ্ঠে এই মন্ত্রোচ্চারণে তিনি অবাক হইয়া গেলেন। এমন সময় সরস্বতীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া বাল্মীকি অভিভূত হইলেন। বনদেবী-গণ দেবীর বন্দনা গান গাহিলেন। বাল্মীকি কালীপ্রতিমাকে উদ্দেশ্য করিয়া গাহিলেন, ‘শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা’।

*** ষষ্ঠ দৃশ্য ***

হঠাৎ সরস্বতীর তিরোভাবে বাল্মীকি হতাশবোধ করিলেন। তখন লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া রাশি রাশি রতনের প্রলোভন দেখাইলেন। কিন্তু বাল্মীকি তাহাতে প্রলুব্ধ না হইয়া লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পুনরায় সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। বাল্মীকির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল ; তিনি জানাইলেন,

‘রব চিরকাল চরণ ধরি তোমারি’

সরস্বতী বলিলেন—

“দীনহীন বালিকার সাজে
এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন—
কেন বৎস, শোন্, তাহা শোন্।

আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান—
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।"

....

"এই নে আমাব বীণা, দিনু তোরে উপহার—
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।"

॥ গীতিনাট্য কালমৃগয়া ॥

বাল্মীকি-প্রতিভার 'নূতন পন্থায় উৎসাহ বোধ করিয়া' রবীন্দ্রনাথ 'কাল-মৃগয়া' নামে আর একটি গীতিনাট্য রচনা করেন। ইহার রচনাকাল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। ইহাব নাট্যবিষয় রামায়ণে বর্ণিত বাজা দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধু বধ। ইহাও বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষ্যে অভিনয়ার্থ বচিত হয় এবং জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে তেতালাব ছাদে স্টেজ বাঁধিয়া ইহার অভিনয় হয়। [৯ই পৌষ ১২৮৯ : ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৮২ শনিবাব] কালমৃগয়ার প্রথম অভিনয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশবথেব ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন।

কালমৃগয়ার আখ্যানবস্তু ঃ

*** প্রথম দৃশ্য ***

অন্ধ ঋষির পুত্র ঋষিকুমার তপোবনে তাহার খেলার সঙ্গিনী লীলার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে—লীলাকে খেলার জন্য ডাকিতেছে। এমন সময় লীলা আসিয়া কহিল, "ও ভাই, দেখে যা কত ফুল তুলেছি।" ঋষিকুমার তাহাকে হাতে মৃণাল-বালা, কানে চাঁপার দুল, মাথায় বেলের সিঁথি, খোঁপায় বকুল ফুল দিয়া সাজাইয়া দিতে চাহিল। তপোবনই তাহাদের খেলার স্থান, ফুল-

পাতাই তাহাদের খেলার প্রধান উপকরণ। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ঋষিকুমার অন্ধ পিতার কথা চিন্তা করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইল।

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

তপোবনে আছেন বনদেবীগণ। তাঁহারা বনপ্রকৃতির নানা মহিমা ও লীলার কথা গাহিয়া বেড়ান। আঁধার রাত্রি আসিতেছে, শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিতেছে দেখিয়া তাঁহারা মাধবী মালতী বেলফুল ফুটাইয়া কানন আলোকিত করিয়া রাখিতে চাহেন। ঋষিকুমার ফুল তুলিতে আসিবে। বনদেবীগণের ইচ্ছা, ফুলগুলি যেন নীচু শাখায় ফোটে যাহাতে ঋষিকুমার তাহার কচি-কচি হাত বাড়াইয়া নাগাল পায়।

* তৃতীয় দৃশ্য *

কুটিরে অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমার বেদপাঠ করিতেছেন। তৃষ্ণায় কাতর হইয়া অন্ধ ঋষি পুত্রকে জল আনিতে বলিলেন, তখন মেঘগর্জন শুনিয়া অন্ধের নয়ন-তারা-স্বরূপ একমাত্র পুত্রকে জল আনিতে যাইতে বারণ করিলেন, ঋষিকুমার বলিল, সরযূ কাছেই, পথও সোজা, চিন্তা করিবার কিছু নাই।

* চতুর্থ দৃশ্য *

বনদেবতাগণ আকাশে মেঘাড়ম্বর ও মেদিনীর ঘোরা রজনীর বর্ণনা করিলেন। ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষণে বনদেবীগণ উল্লসিত। ঋষিকুমার চলিয়াছে সরযূ তটিনী-তীরে তৃষিত পিতার জন্য জল আনিতে, কিন্তু অন্ধকারে পথ চলা দায়। বনদেবীগণ ঋষিকুমারকে যাইতে বারণ করিলেন। পিতার অবস্থা চিন্তা করিয়া ঋষি কুমার জল আনিতে চলিয়া গেল। বনদেবীগণের মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগিলেও তাঁহারা ঋষিকুমারের মঙ্গল-কামনা করিলেন।

* পঞ্চম দৃশ্য *

বনে বনে শিকার করিবার উল্লাসে শিকারীগণ মত্ত। এমন সময় দশরথ শিকার করিতে আসিলেন। শিকারীরা তাঁহাকে বন্দনা করিল। দশরথ শিকার

করিবার জন্য তাহাদের নির্দেশ দিলেন। তাহারা মহা উৎসাহে শিকারে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে দশরথ এক করী-শিশুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সরযুর নিকটবর্তী ঘোর বনে উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যচক্রে তখন ঋষিকুমার সরযুব জলে কুম্ভ পূর্ণ করিতেছেন। দশরথ সেই শব্দকে শিকাবের জলপানের শব্দ মনে করিয়া ভ্রমবশত লক্ষ্য করিয়া বাণ ছাড়িলেন। বনদেবীগণ 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন। দশবথ লক্ষ্য বস্তুর নিকটে গিয়া তাঁহার বাণে আহত ঋষিকুমারকে দেখিয়া দারুণ অনুতপ্ত হইলেন। মৃত্যুপথযাত্রী ঋষিকুমাব দশরথকে শেষ কথা বলিলেন :

"মবণান্তে নিয়ে যেয়ো,
এ দেহ তাঁব কোলে দিয়ো—
দেখো, দেখো, ভুলো নাকো,
কোরো তাঁরে বারিদান!
মার্জনা করিবেন পিতা—
তাঁর যে দয়ার প্রাণ।"

* ষষ্ঠ দৃশ্য *

এদিকে কুটিরে অন্ধ ঋষি পুত্রের প্রত্যাবর্তনেব বিলম্ব দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। খেলার জন্য ঠিক সময়ে ঋষিকুমাব অনুপস্থিত হওয়ায় তাহার খেলার সঙ্গিনী লীলা উদ্বিগ্ন হইয়া অন্ধ ঋষির নিকট অনুসন্ধান করিতে আসিল। অন্ধ ঋষি তখনও কিছুই জানেন না—তাঁহার মনে অমঙ্গল আশঙ্কা হইতেছে, এমন সময় দশরথ ঋষিকুমারের মৃতদেহ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অন্ধ ঋষি মনে করিলেন ঋষিকুমারই আসিল। কিন্তু দশরথের নিকট করী-ভ্রমে তাঁহার পুত্রবধের ঘটনা শুনিয়া ঋষি নিদারুণ শোকে অভিভূত হইলেন এবং দশরথকে অভিশাপ দিলেন :

পুত্র ব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাংপ্রতম্
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ॥

দশরথ অন্ধ ঋষির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অন্ধ ঋষি একমাত্র পুত্রের জন্য পুনরায় শোক প্রকাশ করিলেন এবং অবশেষে দশরথকে মার্জনা করিলেন।.. অনন্তধামে যাত্রার জন্য পুত্রের প্রতি তাঁহার শুভ কামনা জানাইলেন। ঋষি-কুমারের অভাবে বনদেবীগণও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

॥ গীতিনাট্য মায়ার খেলা ॥

মায়ার খেলার প্রকাশকাল ২২শে ডিসেম্বর, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ। মায়ার খেলার প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"আমার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকার সহিত এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারই সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।" এই অকিঞ্চিৎকর গদ্য-নাটিকার নাম 'নলিনী'। ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য নাটক। মায়ার খেলা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "বাল্মীকি প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা।"

মায়ার খেলার আখ্যানবস্তু

* প্রথম দৃশ্য *

প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীগণের আবির্ভাব। মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তিপ্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসি কান্না মিলন বিরহ বাসনা লজ্জা প্রেমের মোহ, এ সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। এক দিন নব বসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল, প্রমোদপুরের যুবক-যুবতীদের নবীন হৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহারা মায়ার খেলা খেলিবে।

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

নবযৌবনবিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব আকাঙ্খা অনুভব করিতেছে। নবীন যুবক অমর উদাসভাবে জগতে তাহার

মানসী প্রতিমাকে খুঁজিতে বাহির হইল। কিন্তু শান্তা অমরকে ভালোবাসে—তাহার আপন প্রাণমন অমরকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে অমর তাহা বুঝিতে পারে নাই এবং শান্তার প্রতি তাহার প্রেমও জন্মিতে পারে নাই। অমর শান্তার ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ পরিহাসছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

* তৃতীয় দৃশ্য *

প্রমদার কুমারী হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। সখীরা ভালোবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। অশোক ও কুমার তাহার নিকটে আপন প্রেম ব্যক্ত করে, কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলে, এ গর্ব তোমার চিরদিন থাকিবে না—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।

* চতুর্থ দৃশ্য *

অমর পৃথিবী খুঁজিয়া তাহার মানসীপ্রতিমার সন্ধান পাইল না। অবশেষে প্রমদার ক্রীড়া কাননে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিল, প্রমদার প্রেম-লাভে অকৃতার্থ হইয়া অশোক আপন মর্মব্যথা পোষণ করিতেছে। অমর বলিল, যদি ভালোবাসিয়া কেবল কষ্টই সার তবে ভালোবাসিবার প্রয়োজন কী? কেন যে লোকে সাধ করিয়া ভালোবাসে অমর বুঝিতেই পারিল না। এমন সময় সখীদের লইয়া প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। প্রমদাকে দেখিয়া অমরের মনে সহসা এক

নূতন আনন্দ ও নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। প্রমদা দেখিল, আর সকলেই তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় তাহার চারিদিকে ফিরিতেছে, কেবল অমর একজন অপরিচিত যুবক দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে আকৃষ্ট হৃদয়ে সখিদের বলিল,- 'উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আয় ও কী চায়!' সখীদের প্রশ্নের উত্তরে অমরের হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল না। সখীরা কিছুই বুঝিল না। কেবল মায়াকুমারীগণ বুঝিল এবং গাহিল—

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে দেখো দেখো, সখী, চাহিয়া।
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া॥

* পঞ্চম দৃশ্য *

অমরের মনে ক্রমে প্রমদাব প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদারও হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল; বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার অবস্থা বুঝিতে পাবিল। পূর্বদৃশ্যে অমরের অস্পষ্ট উত্তর ও ভাবগতিক দেখিয়া অমরের প্রতি সখীদের বিশ্বাস নাই। অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে সখীরা আসিয়া অমরকে প্রচুব ভর্ৎসনা করিল। সরল-হৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা না বুঝিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। ব্যাকুলহৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবসর পাইল না। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

নিমেষের তরে শরমে বাধিল, মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে রহিল মরমবেদনা।

* ষষ্ঠ দৃশ্য *

অমরের অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় সহজেই শান্তার প্রতি ফিরিল। এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্য সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল। শান্তার নিকটে আসিয়া অমর আত্মসমর্পণ করিল। এদিকে

প্রমদার সখীরা দেখিল অমর আর ফিরে না। তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল, বাধা পাইয়া অমরের প্রেমানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহাতে তাহারা নিরাশ হইয়া নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিতে লাগিল— অমর ফিরিল না, সখীদের ইঙ্গিত বুঝিতেই পারিল না। ভগ্নহৃদয়া প্রমদা হতাশ হইয়া অমরের প্রেমের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।

*** সপ্তম দৃশ্য ***

শান্তা ও অমরের বিবাহোৎসবে পুরনারীগণ কাননে সমাগত হইয়া আনন্দগান গাহিতেছে। অমর যখন পুষ্পমালা লইয়া শান্তার গলে আরোপণ করিতে যাইতেছে এমন সময় ম্লান ছায়ার ন্যায় প্রমদা বিবাহ সভায় উপস্থিত হইল। সহসা অনপেক্ষিতভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদপ্রতিমা প্রমদার দীন করুণভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মতো আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্ত ও আর-সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপবে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলনসংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল, "আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুয়াইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পরো, তোমরা সুখে থাক।" অমর শান্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি, এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই ম্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?' শান্তা ধীরে ধীরে কহিল, আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল, প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনের সুখনিশা অবসান হইয়াছে—এই ভুল ভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা শুনাইব।' অমর ও শান্তার এইরূপে

মিলন হইল। প্রমদা শূন্য হৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল···মায়াকুমারীগণ গাহিল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়—এমনি মায়ার ছলনা।

এই গীতিনাট্যে গানের একটা প্লাবন বহিয়া গিয়াছে। কত বিচিত্র সুরের কলধ্বনি রবীন্দ্রনাথের-লিরিক প্রতিভার সহিত উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-প্রতিভার মিলন হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ গীতিকবির সহিত শ্রেষ্ঠ সুরকার মিশিয়া গিয়াছে। একটা বিশিষ্ট অনুভূতি বা ভাব সুরের অনির্বচনীয়ত্বের মাধ্যমে বস্তুভারমুক্ত হইয়া বিশ্বব্যাপি প্রসার লাভ করে, তাই রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্যতম বাহন হইতেছে গান। এই গীতিনাট্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"ইহার অনেককাল পরে 'মায়ার খেলা' বলিয়া আর একটি গীতিনাট্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিষ। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ার খেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত 'মায়ার খেলা' যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসে সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়াছিল।" ইহার অন্তর্নিহিত ভাববস্তু বাল্মীকি-প্রতিভার ভাবের সমগোত্রীয়—ভুল ভাঙিয়া, প্রকৃতিস্থ হওয়ার কাহিনী। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"মায়ার খেলার গানের ভিতর দিয়ে অল্প যে একটুখানি নাট্য দেখা দিচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, প্রমদা আপনার স্বভাবকেই জানতে পারেনি অহঙ্কারে, অবশেষে ভিতর থেকে বাজল বেদনা। ভাঙল মিথ্যে অহঙ্কার প্রকাশ পেল সত্যকার নারী।"

॥ নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ॥

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩৪২ [১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ]।

কাব্য-নাট্যের চিত্রাঙ্গদা ও নৃত্য-নাট্যের চিত্রাঙ্গদা মূলত একই জিনিষ। ভাব ও তত্ত্বের দিক দিয়া উভয়েই এক। কেবল কাব্যকে সঙ্গীতে গলাইয়া লইয়া নৃত্যের ছাঁচে ঢালিয়া নূতন ভাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কাব্যের চিত্রাঙ্গদা সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের উপরই এই নৃত্যনাট্যটি প্রতিষ্ঠিত। কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপর চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।" [বিজ্ঞপ্তি]

চিত্রাঙ্গদার বিষয়বস্তু

"মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া শিব বর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্ত্বেও যখন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হইল তখন রাজা তাঁহাকে পুত্ররূপেই পালন করিলেন। রাজকন্যা অভ্যাস করিলেন ধনুর্বিদ্যা; শিক্ষা করিলেন যুদ্ধবিদ্যা রাজদণ্ডনীতি।

"অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুরে আসিয়াছেন। তখন এই নাট্যের আখ্যান আরম্ভ।"

* প্রথম দৃশ্য *

বালকবেশী চিত্রাঙ্গদা সখীসহ বনে শিকারের আয়োজন করিয়াছেন। বনপথে অর্জুনকে নিদ্রিত দেখিয়া, শিকারের বাধা মনে করিয়া সখী তাঁহাকে

তাড়না করিল। এই স্পর্ধা দেখিয়া অর্জুন ক্রুদ্ধ হইলেন। অর্জুনের পরিচয় পাইয়া চিত্রাঙ্গদা বিস্মিত। বালকবেশীদের দেখিয়া অর্জুন সকৌতুক অবস্থায় প্রস্থান করিলেন। অর্জুনকে চিত্রাঙ্গদার যুদ্ধে আহ্বান ব্যর্থ হইল। এদিকে সখীগণ শিকারের জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার মনোভাব তখন 'মিছে কেন এই খেলা আর'। তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। অর্জুন পুনরায় বন্য অনুচরদের সঙ্গে সেখানে পুনরায় প্রবেশ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

*** দ্বিতীয় দৃশ্য ***

চিত্রাঙ্গদা সখীগণ-পরিবৃত হইয়া স্নান করিতে আসিলেন। তাঁহাকে নূতন আভরণে সাজাইয়া দিতে বলিলেন। এমন সময় অর্জুন সেখানে আসিয়া ধ্যানে উপবেশন করিলেন। চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে হৃদয়-প্রাণ-মন নিবেদন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী ব্রতধারী অর্জুন তাঁহার অক্ষমতা জানাইলেন। চিত্রাঙ্গদা হতাশ হইয়া মদনের আরাধনা করিলেন, এবং তাঁহার মনোবাসনা জানাইলেন। মদন তাঁহাকে কান্তহৃদয়-বিজয়ে ধন্যা হইবার জন্য বর দিলেন।

*** তৃতীয় দৃশ্য ***

মদনের বরে চিত্রাঙ্গদা নূতন রূপ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার দেহে নারীত্বের বিকাশ দেখিয়া নিজেই বিস্মিত হইলেন। চিত্রাঙ্গদার নূতন রূপে আকৃষ্ট হইয়া অর্জুন তাঁহার প্রেম নিবেদন করিলেন। অর্জুন দিলেন আত্মপরিচয়। চিত্রাঙ্গদা তাঁহার নবলব্ধ রূপের ক্ষণিকতা সম্বন্ধে অর্জুনকে অবহিত করিলেন। কিন্তু অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রেমে অধীর হইলেন।

*** চতুর্থ দৃশ্য ***

বরলব্ধ রূপের ক্ষণিকতার জন্য চিত্রাঙ্গদা উদ্‌বিগ্ন হইলেন। মদন তাঁহাকে অভয় দেন। চিত্রাঙ্গদাকে লাভ করিয়া অর্জুনের দেহমনপ্রাণ দিবানিশি অবসাদগ্রস্ত। এদিকে গ্রামবাসীগণ দস্যুভয়ে ভীত। অর্জুনের প্রশ্নে তাহারা জানাইল, তাহাদের রক্ষাকর্ত্রী গোপনব্রতধারিণী রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা তীর্থে গিয়াছেন। স্নেহবলে মাতা ও বাহুবলে রাজা-রূপিণী চিত্রাঙ্গদার জন্য অর্জুন ব্যগ্র

হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মোহগ্রস্ত অবস্থা দেখিয়া নব-রূপপ্রাপ্তা চিত্রাঙ্গদা তাঁহার নারীপ্রকৃতির দৈন্যের কথা জানাইলেন। তাহাতেও অর্জুনের ব্যাকুলতা দূর হইল না। চিত্রাঙ্গদা বলিলেন, "কাল শুভ শুভ্র প্রাতে দর্শন মিলিবে তার।" অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া সখীগণ জানাইল—

রজনীর নর্মসহচরী
যেন হয় পুরুষের কর্মসহচরী
যেন বামহস্তসম দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী।
তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয়, বীরোত্তম॥

* পঞ্চম দৃশ্য *

চিত্রাঙ্গদা তাঁহার পূর্ব-রূপ ফিরিয়া পাইবার জন্য মদনদেবকে প্রার্থনা জানাইলেন। মদনদেব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

* ষষ্ঠ দৃশ্য *

চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ অর্জুনকে বরণ করিল। চিত্রাঙ্গদা কহিলেন—

আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী॥

অর্জুন কহিলেন—

ধন্য ধন্য ধন্য আমি।

সকলে মিলিয়া আনন্দোৎসবে মাতিয়া উঠিল।

॥ নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ॥

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার প্রকাশকাল ফাল্গুন ১৩৪৪ সাল। নাটক "চণ্ডালিকা'রই ইহা নৃত্য-নাট্যরূপ। প্রথমে গদ্য-ভাষণকে সঙ্গীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া নৃত্য প্রবর্তিত হইয়াছে। ফুলওয়ালী, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা প্রভৃতির উপস্থিতি নৃত্যনাট্যে নূতন সংযোজন।

'চণ্ডালিকা'র মূল ভাবটি নরনারীর একটি চিরন্তন চিত্ত-দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। চণ্ডালিকা দেহের আকর্ষণী-শক্তি দ্বারা আনন্দর মনে আদিম প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তাহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, শেষে তাহার দেহাভোগাকাঙ্ক্ষা পরিসমাপ্ত হইয়াছে আত্মবিলোপী প্রেমে। আনন্দর মধ্যেও জাগিয়াছে ত্যাগের আদর্শ ও মনোবৃত্তির সঙ্গে যৌনক্ষুধার দ্বন্দ্ব, শেষে দেহলালসার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াও সে পরে তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছে। নাটক 'চণ্ডালিকা'য় নরনারীর এই মানসিক দ্বন্দ্ব, এই জটিলতা, সুর ও তালের ছন্দে, দেহ-ভঙ্গিমার মধ্য দিয়া বোধ ও অনুভবগম্য করিয়া তোলাই নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র উদ্দেশ্য।

নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নৃত্যকলারসিক প্রতিমা দেবী বলিয়াছেন—চণ্ডালিকার ভূমিকা হ'ল খাঁটি সাহিত্য ; একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা। মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে, তারই আঘাতে দোল-খাওয়া মন নৃত্যসঙ্গীতের তালে তালে আপনাকে বিচ্ছুরিত করে দিল অবসাদ-বিষাদ করুণার আতিশয্যে। তালের ছন্দ ও সুরের প্রেরণায় মূক হৃদয়ের বাণী মুখরিত হয়েছিল সুরের বিচিত্র কারুকার্যে।

যেখানে অবসাদক্লান্ত মন, পূরবী এল তার আমেজ নিয়ে, যেখানে দৃঢ়তায় দর্পিত চিত্তের ঝংকার—বাউল বেজে উঠল গৌরবে। এইরূপে অধৈর্যের ঐক্যতানের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল বিচিত্র সুরের ব্যঞ্জনা।

সুর চলেছে নদীর স্রোতের মতো—কখনো তার উদ্দাম মূর্তি, কখনো তার অবসাদের বিরাম, আর কোথাও বা সে অধৈর্যের ছন্দে ত্রস্ত। তারপর সে স্রোত পৌঁছল গিয়ে অগাধ সমুদ্রে। বাসনা তলিয়ে গেল প্রেমের অকূল পাথারে। ঝড় থামল, এল শান্তি। দেহের কামনা চিত্তের অন্তরতম তলায় প্রেমের মহিমাকে খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত হ'ল, পূর্ণ হ'ল।

চণ্ডালিকার বিষয়বস্তু

* প্রথম দৃশ্য *

ফুলওয়ালির দল ফুল বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। চণ্ডালিকাও তাহার ফুলের ডালি আনিল। সবাই ঘৃণায় তাহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। দইওয়ালা দই বিক্রয় করিতে আসিল, চণ্ডালিকা প্রকৃতি দই কিনিবার জন্য হাত বাড়াইতেই দইওয়ালাকে সবাই নিষেধ করিল। চুড়িওয়ালা চুড়ি বিক্রয় করিতে আসিল; প্রকৃতি চুড়ি কিনিতে চাহিতেই চুড়িওয়ালাকে সবাই সতর্ক করিয়া দিল। চণ্ডালিকা মনের দুঃখে তাহার সৃষ্টিকর্তাকে ধিক্কার দিল। প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ। ঘরের কাজে চণ্ডালিকার ঔদাসীন্য দেখিয়া মা তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেই, মা তাহাকে অপমানের মধ্যে জন্ম দিয়াছে বলিয়া তিরস্কার করিল। মা বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধদেবের শিষ্য আনন্দ আসিয়া জল চাহিলেন। তাহার হাতের জল অশুচি বলিয়া চণ্ডালিকা সংকোচ প্রকাশ করিল। আন্দন বলিলেন "যে জল তৃষিতের তৃষ্ণা দূর করে, তাপিতের তাপ শান্ত করে, সেই জলই শুচি।" তিনি জল খাইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার করুণা ও তাঁহার রূপে প্রকৃতির মন মুগ্ধ হইয়া গেল। পাড়ার মেয়েরা উহাকে ধানকাটার কাজে ডাকিতে আসিল। প্রকৃতি বলিল—

"ওগো, ডেকো না, মোরে ডেকো না।
আমার কাজ ভোলা মন, আছে দূরে কোন—
করে স্বপনের সাধনা।"

* দ্বিতীয় দৃশ্য *

বুদ্ধের পূজার অর্ঘ লইয়া পথ দিয়া পূজারিনীরা চলিয়া গেল। প্রকৃতি আসিয়া গাহিল—

"ফুল বলে, ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির প'রে।
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।"

মা আসিয়া বলিল—"তুই অবাক করিলি যে, উমার মত তুই তপস্যা করছিস নাকি। তোর সাধনা কার জন্যে।" চণ্ডালিকা বলিল,—যে আমাকে আহ্বান করিল, তার জন্যে। আমি ছিলাম বাণীহারা, যে আমাকে বাণী দিয়াছে, আমার মনের মধ্যে যে বাজাইয়া দিয়া গিয়াছে 'জল দাও, জল দাও, জল দাও' তার জন্যে। মা বলিল "তোর কাছে কে আবার জল চাইলে, সেকি তোর আপন লোক নাকি।" প্রকৃতি বলিল "তিনি বলিয়াছেন, তিনি আমার আপন লোকই বটেন। তিনি আমাকে নব জন্ম দিয়াছেন। মন্ত্র পড়ে তুই নিয়ে আয় ভিক্ষুকে এই অমানিতার পাশে, আমি তাঁহাকে আত্মনিবেদনের সম্মান দেব।" এতো বড় স্পর্ধার কথা শুনিয়া মা স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন সময় ভিক্ষুর দল লইয়া আনন্দ পথ দিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার দিকে তাকাইলেন না দেখিয়া চণ্ডালিকার অসহ্য ক্ষোভ হইল। মা বলিল "মন্ত্র পড়ে আমি ওঁকে আনবই।" তার শিষ্যাদের সঙ্গে সম্মোহন-নৃত্য করে কন্যার হাতে একটা মায়াদর্পণ দিল। বলিল, "এই দর্পণ নিয়ে যখন তুই নাচবি দেখতে পাবি তাঁর কী দশা হচ্ছে।"

*** তৃতীয় দৃশ্য ***

এই দৃশ্যে মন্ত্রের কাজ চলিয়াছে। মায়াদর্পণে আনন্দের অভিনব-দৃশ্য দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রকৃতি অনুতপ্ত হইতেছে, মা নিষেধ করিতেছে, আবার তাহাকে উৎসাহিত করিতেছে। অবশেষে মহাকালনাগিনীমন্ত্র-প্রভাবে টান ধরিল। পরাভূত আনন্দের অসম্মানে দুঃখার্ত হইয়া আনন্দকে প্রকৃতি প্রণাম করিয়া বলিল—

ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,
ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।

॥ নৃত্যনাট্য শ্যামা ॥

নৃত্যনাট্য শ্যামার প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৪৬ সাল। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যের 'পরিশোধ' কবিতাটি হইল 'শ্যামা'র মূল ভিত্তি। এই কবিতার ভাবকে সঙ্গীতে পরিবর্তিত করিয়া নৃত্যনাট্যের উপযোগী করা হইয়াছে।

ধর্মচেতনা এবং ন্যায়বোধের সহিত প্রেমের দ্বন্দ্ব অতি সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে বজ্রসেনের চরিত্রে। সরল, নিরপরাধ যথার্থ প্রেমিক উত্তীয়ের জীবন গ্রহণ করিয়াছে শ্যামা বজ্রসেনের জন্য। বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার প্রেমের মধ্যে রহিয়াছে যথার্থ প্রেমের অপ্রতিদানরূপ হৃদয়হীনতা, স্বীয় প্রেমাস্পদকে লাভ করিবার জন্য নিতান্ত সরল, শুভ্র, আবেগ-বিহ্বল একটি জীবনকে হত্যার মহাপাপ। বজ্রসেন বুঝিল, মহাপাপমূল্যে কেনা তাহার জীবন একটা বর্বরোচিত পাপের চরম নিদর্শন, আর বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার প্রেম এক পাষাণ-হৃদয়া দানবী নারীর যে কোন উপায়ে জঘন্য দেহলিপ্সা-চরিতার্থতায়

আকাঙ্ক্ষামাত্র। তাই বজ্রসেন নিজের জীবনকে শতবার ধিক্কার দিল ও শ্যামার প্রেমকে ঘৃণিত বোধ করিল। দারুণ ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় শ্যামার সঙ্গ সে বিষবৎ ত্যাগ করিল এবং তাহাকে হত্যা করিবার জন্য দারুণ আঘাত করিল। কিন্তু হৃদয়ের দিক হইতে সে শ্যামাকে ভালোবাসিয়াছিল। শ্যামার সঙ্গ তাহার বহুবাঞ্ছিত। তাই শ্যামাকে ত্যাগ করিয়াও সে আবার বহ্নিমুখ-পতঙ্গের মতো শ্যামার জন্য ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত অন্তর দিয়া শ্যামাকে কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্যামার আবির্ভাবে আবার তাহার বিবেক ও ধর্মবুদ্ধি মাথা উঁচু করিয়া হৃদয়কে ঢাকিয়া ফেলিল। সে শ্যামাকে আবার তাড়াইয়া দিল। বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের—বিবেকের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্বই বজ্রসেন—শ্যামা আখ্যায়িকার মূলবস্তু।

শ্যামার বিষয়বস্তু ঃ

*** প্রথম দৃশ্য ***

বজ্রসেন বণিক। সে অনেক সন্ধান করিয়া ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা, এই হার সে কাহাকেও বেচিবে না। বিনামূল্যে যাহাকে পরাইতে চায় তাহাকেই খুঁজিয়া বাহির করিবে। বন্ধু বলিল "এই হারের প্রতি রাজার চরের লক্ষ্য আছে।" বজ্রসেন বলিল, "সেই ভয়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছি।" বলিতে বলিতে কোটালের চর আসিয়া বলিল, "তোমার পেটিকায় কী আছে দেখাও।" বজ্রসেন বলিল, "এ তুমি ছুঁয়ো না, ইহা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়।" বলিয়া সে ছুটিয়া গেল। কোটালের চর বলিল, "দেখিব তুমি কোথায় পালাও।"

*** দ্বিতীয় দৃশ্য ● শ্যামার সভা ***

শ্যামা রাজনটী বিখ্যাত সুন্দরী। তাহার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। সে দূর হইতে শ্যামার পূজা করে। সখীদের করুণা তাহার উপর। শ্যামা নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত, এমন সময় চোর অপবাদ দিয়া প্রহরী শ্যামার সভার মধ্য দিয়া বজ্রসেনের পিছনে পিছনে ছুটিয়া গেল। শ্যামা বজ্রসেনের দেবকান্ত

মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইল। সখীকে পাঠাইয়া বজ্রসেনের সহিত প্রহরীকে ডাকিয়া পাঠাইল; বজ্রসেনকে বাঁচাইবার জন্য দুইদিন সময় চাহিল। প্রহরী তাহাতে রাজী হইল। সভাস্থদিগের উদ্দেশ করিয়া বলিল, "তোমাদের মধ্যে এমন কে বীর আছে যে, এই নিরপরাধ বিদেশীকে অন্যায় অপবাদ হইতে রক্ষা করিবে।" উত্তীয় আসিয়া বলিল, "ন্যায় অন্যায় জানি না, ঐ বিদেশীর নামেব অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করিয়া প্রাণ দিব—সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সহিত আমার মিলন হইবে।" প্রহরীর নিকট সে আত্মসমর্পণ করিল। কারাগারে উত্তীয়ের মৃত্যু হইল।

* তৃতীয় দৃশ্য ● পথে *

বজ্রসেনের সহিত শ্যামাব মিলনের আনন্দ। দেশত্যাগ কবিয়া বজ্রসেন ও শ্যামার পলায়ন। পলাতকা রাজনটীর সন্ধানে প্রহরীব অনুসরণ। সখীরা তাহাকে ছলনা করিয়া ভুলাইয়া দিল। শ্যামাকে বার বার বজ্রসেনের প্রশ্ন কী উপায়ে তাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। অবশেষে শ্যামার নিকট শুনিল তাহার জন্য উত্তীয় প্রাণ দিয়াছে। বজ্রসেন তাহাকে ধিক্কার দিল। ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বর্জন করিয়া চলিয়া যাইবার সময় শ্যামা তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না। বজ্রসেন তাহাকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া চলিয়া গেল। শ্যামার প্রতি প্রেম ভুলিতে পারিল না, অনুতাপে দগ্ধ হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, শ্যামাকে মৃত্যুলোক হইতে ডাকিতে লাগিল। সেই আহ্বানে শ্যামার হঠাৎ আবির্ভাব। বলিল, তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিল, আমি মরণের দ্বার হইতে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছি।" আবার বজ্রসেনের মনে ধিক্কার জাগিল; বলিল, "যাও যাও যাও, যাও চলে যাও।" শ্যামা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'য় কবি বজ্রসেনের চরিত্রে শেষের দিকে একটু বৈশিষ্ট্য আনিয়াছেন। 'পাপকে ঘৃণা কর, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না'—এই

মহাজন-বাক্য মনে করিয়া বজ্রসেন শ্যামাকে প্রত্যাখ্যানের দরুণ ভগবানের নিকট তাহার দুর্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে,—

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু !
মরিছে তাপে, মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা—
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু !
প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু ॥

"উত্তীয়ের হত্যার দৃশ্যটি সমালোচকদের কাহারো কাহারো মতে 'শ্যামা' নাটকের একটি দুর্বল অংশ। গুরুদেবও তাহাই মনে করিতেন, তবুও তিনি ঐ অংশটি নাটক হইতে বাদ দেন নাই। হত্যাটি তালযন্ত্রের বোলের সাহায্যে রাখিয়াছিলেন। এই অংশটি নাটকের মাঝখানে দর্শকের চিত্তকে মৃত্যুর দৃশ্যে ও ঘাতকের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে রসান্তরে লইয়া বিশ্রাম দেয় বলিয়াই ইহা দুর্বল হইলেও দর্শকবৃন্দ ইহা লইয়া কোন আপত্তি করেন নাই। সেইজন্যই হয়তো গুরুদের এই অংশটি বাদ দেন নাই।…

এই নাটকেই শান্তিনিকেতনের নৃত্য-ইতিহাসে ভারতের তিনটি প্রধান নৃত্যধারার অপূর্ব সম্মিলন হইয়াছিল।…বজ্রসেনের চরিত্র অভিনীত হইয়াছিল ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি পদ্ধতিতে, উত্তীয় হইয়াছিল নিখুত কথকের আদর্শে, শ্যামার অভিনয় হইয়াছিল শান্তিনিকেতনে প্রচলিত মণিপুরী ভঙ্গীতে আর প্রহরী নাচ খাঁটি কথাকলির আঙ্গিকে।"

এসরাজের বর্ণনা

সারেঙ্গী এবং সেতার যন্ত্রের মিশ্রণে এসরাজ যন্ত্রের উৎপত্তি।...পাঠান বংশীয় আলাউদ্দিনের সময়ে, সঙ্গীতজ্ঞ অমীর খসরু দেহলবী বীণা যন্ত্র ভাঙিয়া যেমন সেতার যন্ত্রটি সৃষ্টি করেন, সেইরূপ কাশীধামের নিকটস্থ সঙ্গীতজ্ঞ নবীবক্স সারেঙ্গী ও সেতার সংযোগে এসরাজ যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। সেইজন্য ইহার দণ্ডটি অবিকল সেতারের ন্যায় এবং খর্পরটি সারেঙ্গীর অনুরূপ। এসরাজের দণ্ডটি কাঠের তৈয়ারী। এই দণ্ডের গায়ে সেতারের মত পর্দাগুলি মুগা সুতা দিয়া বাঁধা থাকে। দণ্ডের নীচের কাঠের উপরিভাগ চামরা দ্বারা ঢাকা থাকে ইহাকে তবলী বলা হয়। তবলীর মধ্যস্থলে হাতীর দাতের তৈয়ারী একটি বীজ বসান থাকে। তবলীর নীচে যাহার সহিত তার সংযুক্ত থাকে তাহাকে লঙ্গোট বলে। দণ্ডের মাথার দিকে চারিটি খুটি বা কান থাকে। লঙ্গোটে তারের একপ্রান্ত বাঁধা থাকে এবং অপরপ্রান্ত খুঁটিতে জড়ান থাকে। পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠফলকে ১৬টি কান সংলগ্ন থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে যে তারগুলি বাঁধা থাকে তাহাদের তরফ বলা হয়। এসরাজের মুখ্য তার চারিটি। প্রথম তারটি ষ্টীলের। এই তারটি মন্দ্র সপ্তকের মধ্যমে মিলান হয়। দ্বিতীয় তৃতীয় তার দুইটিকে বলা হয় জুড়ির তার। এই তার দুইটিকে মন্দ্র সপ্তকের ষড়জে মিলান হয়। চতুর্থটি পিতলের তারটিকে সাধারণত মন্দ্র পঞ্চমের সহিত মিলান হয়। প্রয়োজন অনুসারে অনেক বাদ্যকার ম্ সা প্ সা ইত্যাদি সুরে মিলাইয়া থাকেন। এসরাজ যন্ত্রটি সারেঙ্গীর মত ডান হাতে ছড়ি টানিয়া বাম হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে বাজান হয়।

দিলরুবার বর্ণনা

এসরাজের বড় আকারকে বলা হয় দিলরুবা। ইহাকে সেতার ও সারেঙ্গীর রূপান্তর বলা চলে। দিলরুবার উপরিভাগ সেতারের মত এবং নিম্নাংশ সারেঙ্গীর মত। দিলরুবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এসরাজের মত। বাজাইবার পদ্ধতিও

এক। দিলরুবা এসরাজ হইতে বড় হয়। তরফের তারও দিলরুবাতে বেশী থাকে। দিলরুবার আওয়াজ এসরাজ অপেক্ষা গম্ভীর।

একতারার বর্ণনা

একতারাতে একটি মাত্র তার থাকে। ইহার নিম্নাংশ একটি লাউয়ের খোলা দ্বারা নির্মিত। খোলটির উপরিভাগ চর্মাবৃত। খোলের উপরে দুইটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে ৩।৪ ফুট দীর্ঘ দুইটি বাঁশের দণ্ড লাগান থাকে। এই দণ্ডটির মাথার দিকে একটি কান থাকে। চামড়ার ছাউনির উপরে একটি ব্রীজ বা সওয়ারী বসান থাকে। এই ব্রীজের উপর দিয়া একটি তার দণ্ডের নীচের দিক হইতে উপরের কানের সহিত সংযুক্ত থাকে। একটি মাত্র আঙুল দ্বারা তারে আঘাত করিয়া একতারা বাজান হয়।

আনন্দলহরীর বর্ণনা

ইহাকে দেখিতে অনেকটা ঢোলকের মত। আনন্দলহরীর আর এক নাম খমক। চলতি ভাষায় ইহাকে 'গাব্‌গুবাগুব'ও বলা হয়। ইহার খোলটি কাঠ দ্বারা তৈয়ারী। খোলের নিম্নাংশ চর্মাবৃত ও উপরের মুখটি খোলা। নীচের চর্মাবৃত অংশটির ঠিক মাঝখানে ছিদ্র করিয়া একটি গোতন্তু ঢোকান হয় এবং গোতন্তুটির অপর দিকে যে একটি কাঠের ভাঁড় থাকে তাহার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। খোলটিকে বাম বগলে চাপিয়া ডান হাত দ্বারা তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া আনন্দলহরী বাজাইতে হয়।

যদু ভট্ট

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মধুসূদন ভট্টাচার্য একজন প্রসিদ্ধ বীণাবাদক, উচ্চস্তরের কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পী ও মার্গ-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধ ছিলেন। পিতার নিকট যদুনাথ সেতার ও মৃদঙ্গবাদন শিক্ষা করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিং দিল্লী হইতে তানসেন বংশীয় ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ ও মৃদঙ্গী পীরবক্সকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বিষ্ণুপুরের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অনুরোধে বাহাদুর খাঁ কয়েকজন প্রতিভা-

সম্পন্ন যুবকের সঙ্গীত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বাহাদুর খাঁর শিষ্যদিগের মধ্যে গদাধর চক্রবর্তী ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং রামশঙ্কর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরের রাজদরবারের সভাগায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, অমৃতলাল ও যদু ভট্ট বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। যদুনাথের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সহিত সেকালের কোন গায়কের কণ্ঠস্বর তুলনীয় ছিল না বলিয়া যদুনাথ কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনায় মনোযোগী হন এবং পরবর্তীকালে যদু ভট্ট নামে পরিচিত হন।

প্রথম যৌবনে যদুভট্ট রামশঙ্কর ভট্টার্যের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন, অতঃপর রামশঙ্করের মৃত্যু হইলে যদুভট্ট গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়েব নিকট ধ্রুপদ শিক্ষা আরম্ভ করেন ও সঙ্গীতবিদ্যায় অধিকতর উৎকর্ষ লাভের জন্য কাশী, দিল্লী, গোয়ালিয়র, জয়পুর ও অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাহার ফলে তাঁহার সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। ২২ বৎসর বয়সে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সঙ্গীত রচনায় মনযোগী হন। বাঙালী হইয়াও তাঁহার রচিত হিন্দী ধ্রুপদ গান রচনা নৈপুণ্যে বিখ্যাত হিন্দুস্থানী রচয়িতাদিগের গীত রচনাকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। যদু ভট্ট যখন বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন পঞ্চকোটের রাজা তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দান করেন।

এই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে যদু ভট্ট জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যাইয়া মহর্ষিকে গান শোনান। তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিশেষ সৌহার্দ্য থাকায় ঠাকুর বাড়ীর মাধ্যমেই যদু ভট্ট ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সহিত পরিচিত হন এবং ত্রিপুরায় যান। সেখানে তাঁহার গান শুনিয়া ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যবাহাদুর তাঁহাকে 'তানরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময় তানসেন বংশীয় বিখ্যাত রবাবী কাসেম আলি খাঁ ত্রিপুরা রাজদরবারের রবাব বাদক ছিলেন।

তিনি যাহা বাজাইতেন যদু ভট্ট তাহা শোনা মাত্র আয়ত্ত করিতেন। এই কারণে কাসেম আলি খাঁ ত্রিপুরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যান। ত্রিপুরার মহারাজা বিশেষভাবে অনুরোধ করা সত্বেও যদু ভট্ট স্থায়ীভাবে ত্রিপুরা রাজ-দরবারে থাকিতে অস্বীকৃত হন।

গৃহশিক্ষকরূপে ঠাকুরবাড়ীতে থাকা কালে যদু ভট্ট রবীন্দ্রনাথকে মার্গ-সঙ্গীতে শিক্ষাদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদু ভট্ট রচিত খাণ্ডারবাণী ও অন্যান্য ধ্রুপদের সুর ও ছন্দ লইয়া বাংলা গান রচনা করেন। যদু ভট্ট বেশীর ভাগ সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে থাকিতেন। এবং মাঝে মাঝে ত্রিপুরার মহারাজকে গান শুনাইয়া আসিতেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে যদু ভট্ট বিবাহ করেন; তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। যদু ভট্ট মৃত্যুকাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য ও ঠাকুর বাড়ীর সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

যদু ভট্টের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। স্রষ্টা হিসাবে তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। এই ওস্তাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "ছেলে-বেলায় আমি একজন বাঙালী গুণীকে দেখেছিলাম; গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজ মর্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মত তাল-ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনিই বিখ্যাত যদু ভট্ট। যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসতো তাঁর কাছে শিখতে; কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ। বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।" অনন্য সাধারণ প্রতিভার গুণে যদু ভট্ট সর্বভারতীয় খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেন, যাহা তৎকালে কোনও বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞের ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগমন করেন এবং কয়েক মাস রোগশয্যায় থাকিয়া মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যদু ভট্টের দান অমর কীর্তিরূপে চিরদিন বাঙালীর গৌরবের বস্তু হইয়া থাকিবে।

দ্বিজু ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে দ্বিজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কবি, গণিতজ্ঞ, দর্শনতত্ত্ববিদ্ এবং শর্টহ্যাণ্ড এবং স্বরলিপির উদ্ভাবক। মাত্র ২০ বৎসর বয়সেই তাঁহার রচিত মেঘদূতের পদানুবাদ প্রকাশিত হয়। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নামক রূপক কাব্যটি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গ সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। দীর্ঘকাল তিনি 'ভারতী' ও 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঁশি ও অর্গান বাদনায় নিপুণ ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আকার মাত্রিক স্বরলিপির প্রথম সূত্রপাত করেন। সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় তাঁহার কৃতিত্বের সাক্ষর আছে। তিনি বেশ কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে 'অকূল ভাব-সাগর', 'অনুপম মহিম পূর্ণব্রহ্ম', 'আনন্দে আকুল সবে', 'কর তাঁর নাম গান' প্রভৃতি গানগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৭৯১ শকের কার্তিক [অক্টোবর ১৮৬৯] সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার শেষে সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী ও পাঁচটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্ববলিপি প্রকাশিত হয়। এই স্বরলিপিগুলি দ্বিজেন্দ্রনাথ করেন। পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গে তাঁহার লেখা হইতে জানা যায় যে তিনিই বাঙলাভাষায় প্রথম স্বরলিপি রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন খাঁটি স্বদেশী ছিলেন। তাঁহার রচিত একটি দেশাত্মবোধক গান 'মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি' হিন্দুমেলার জন্য রচিত ও গীত।

পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পরের দিন তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ি চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে চলিয়া যান। সেখানেই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

॥ চতুর্থ বর্ষ ॥

রাগ-ভুপালী ঃ পরিচয়

এই রাগ কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। মা ও না বর্জিত। ঔড়ব—ঔড়ব জাতি। গা বাদী ও ধা সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি শান্ত।

আরোহ ঃ সা রা গা পা ধা র্সা

অবরোহ ঃ র্সা ধা পা গা রা সা

পকড় ঃ গা রা সা ধ্‌া, সা রা গা, পা গা, ধা পা গা, রা সা।

রাগ-বেহাগ ঃ পরিচয়

এই রাগ বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। ইহাতে সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। শ্রুতিমধুর করিবার জন্য অবরোহতে পঞ্চমের সহিত তীব্র মধ্যম মাঝে মাঝে বিবাদী স্বররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। আরোহতে রা ধা বর্জিত ও অবরোহ সম্পূর্ণ। ঔড়ব—সম্পূর্ণ জাতি। গা বাদী ও না সমবাদী। গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর।

আরোহ ঃ সা গা মা পা না র্সা

অবরোহ ঃ র্সা না ধা পা মা গা রা সা

পকড় ঃ ন্‌া সা গা মা পা, গা মা গা, রা সা।

রাগ-মারবা ঃ পরিচয়

এই রাগ মারবা ঠাটের অন্তর্গত। ইহা মারবা ঠাটের আশ্রয়রাগ। ইহাতে ঋা কোমল হ্মা তীব্র ও বাকী সব শুদ্ধ স্বর ব্যবহার হয়। পঞ্চম বর্জিত। খাড়ব—খাড়ব জাতি। আরোহতে না বক্রভাবে ব্যবহার হয়। ঋা বাদী ও ধা সমবাদী। গাহিবার সময় দিবা শেষ প্রহর। সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ। প্রকৃতি গম্ভীর। পূর্বাঙ্গবাদী রাগ।

আরোহ ঃ সা ঋা, গা, হ্মা ধা, না ধা র্সা

অবরোহ ঃ র্সা না ধা, হ্মা গা ঋা সা

পকড় ঃ ধা হ্মা গা ঋা, গা হ্মা গা ঋা, সা।

পর্যায় : পূজা

১.	নয় এ মধুর খেলা	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ৪০
২.	হে চির নূতন, আজি এ দিনের	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫
৩.	অগ্নিবীণা বাজাও তুমি	তাল তেওরা	স্বরবিতান ৪৪
৪.	পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহো ভাই	তাল ঝম্পক	স্বরবিতান ৪০
৫.	আছে দুঃখ আছে মৃত্যু	তাল একতাল	স্বরবিতান ২৭
৬.	প্রতিদিন তব গাথা	তাল সুরফাঁকতাল	স্বরবিতান ২৩
৭.	প্রথম আদি তব শক্তি	তাল সুরফাঁকতাল	স্বরবিতান ৩৬
৮.	তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন	তাল চৌতাল	স্বরবিতান ২২
৯.	গরব মম হরেছ, প্রভু	তাল ধামার	স্বরবিতান ২২
১০.	দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া	তাল একাদশী	স্ববিতান ৪

পর্যায় : প্রেম

১.	তোমায় গান শোনাব	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৩০
২.	যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৩৯
৩.	এই উদাসী হাওয়ার পথে পথে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৫৯
৪.	আমার পরাণ যাহা চায়	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ৪৮
৫.	এ আবরণ ক্ষয় হবে গো	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪৪
৬.	সখী ভাবনা কাহারে বলে	তাল একতাল	স্বরবিতান ২০
৭.	পুষ্পবনে পুষ্প নাহি	তাল আড়খেমটা	স্বরবিতান ১০
৮.	আকাশে আজ কোন চরণের	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১৪
৯.	হায় অতিথি, এখনি কি	তাল ষষ্ঠী	স্বরবিতান ১৩
১০.	কেন সারাদিন ধীরে ধীরে	তাল রূপকড়া	স্বরবিতান ৩৩

পর্যায় : প্রকৃতি

১.	আবার এসেছে আষাঢ়	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১১
২.	না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৬

৩. কাঁপিছে দেহলতা থর থর	তাল একাদশী	স্বরবিতান ১৬
৪. তুমি যেয়ো না এমনি	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ১০
৫. আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল	তাল দাদরা	স্বরবিতান ১১
৬. কিছু বলব ব'লে এসেছিলেম	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫৩
৭. উতল ধারা বাদল ঝরে	তাল রূপকড়া	স্বরবিতান ৩৬
৮. সে দিন আমায় বলেছিলে	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১৫
৯. আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে	তাল ত্রিতাল	স্বরবিতান ৩৮
১০. যদি তারে নাই চিনি গো	তাল তেওরা	স্বরবিতান ৬

পর্যায় : স্বদেশ

১. আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৪৭
২. শুভ কর্মপথে ধর	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪৭
৩. হে ভারত আজি, তোমারি	তাল একতাল	স্বরবিতান ৪৭
৪. কেন চেয়ে আছ, গো মা	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৪৭
৫. জননীর দ্বারে আজি ওই	তাল একতাল (চতুর্মাত্রিক)	স্বরবিতান ৪৬

পর্যায় : আনুষ্ঠানিক

১. দুইটি হৃদয়ে একটি আসন	তাল একতাল	স্বরবিতান ৫৫
২. সুমঙ্গলী বধূ	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ৫৫
৩. দুটি প্রাণ এক ঠাঁই	তাল ঝাঁপতাল	স্বরবিতান ৫৫

পর্যায় : বিচিত্র

১. আমরা নূতন যৌবনেরই দূত	তাল ষষ্ঠী	স্বরবিতান ১২
২. কী পাইনি	তাল কাহারবা	স্বরবিতান ১
৩. তোমার আসন শূন্য আজি	তাল দাদরা	স্বরবিতান ৫৭

ধামার তাল ঃ ১৪ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´ ০ ২ ০ ৩

I ক ধে টে । ধে টে । ধা - । গ তে টে । তে টে তা - I

পরিচয়

এই তালের ১৪টি মাত্রা। ৫টি বিভাগ প্রথম বিভাগে তিনটি, দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি, তৃতীয় বিভাগে দুইটি, চতুর্থ বিভাগে তিনটি ও পঞ্চম বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। তিনটি তাল ও দুইটি ফাঁক। প্রথম, ষষ্ঠ ও একাদশ মাত্রায় তাল ও চতুর্থ, অষ্টম মাত্রায় ফাঁক। বিষমপদী তাল।

ধামার তালের দ্বিগুণ

১´ ০ ২

I কধে টেধে টেধা । -গ তেটে । তেটে তা- ।

০ ৩

কধে টেধে টেধা । -গ তেটে । তেটে তা- I

চৌতাল ঃ ১২ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪

I ধা ধা । দেন্ তা । কেটে ধা । দেন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে I

পরিচয়

এই তালের ১২টি মাত্রা। ছয়টি বিভাগ। প্রতি বিভাগে দুইটি করিয়া মাত্রা আছে। চারিটি তাল ও দুইটি ফাঁক। প্রথম, পঞ্চম, নবম, একাদশ মাত্রায় তাল ও তৃতীয়, সপ্তম মাত্রায় ফাঁক। সমপদী তাল।

চৌতালের দ্বিগুণ

১´ ০ ২

I ধাধা দেন্তা । কেটেধা দেনতা । তেটেকতা গদিঘেনে ।

০ ৩ ৪

ধাধা দেন্তা । কেটেধা দেন্তা । তেটেকতা গদিঘেনে I

সুরফাঁক তাল ঃ ১০ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´ ২ ৩
I ধা ধা দেন্ তা । কেটে ধা । তেটে কতা গদি ঘেনে I

পরিচয়

এই তালের দশটি মাত্রা। তিনটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে চারিটি, দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি ও তৃতীয় বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। তিনটিই তাল। কোন ফাঁক নাই। প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তম মাত্রায় তাল।

সুরফাঁক তালের দ্বিগুণ

১´ ২
I ধাধা দেনতা কেটেধা তেটেকতা । গদিঘেনে ধাধা I

৩
দেনতা কেটেধা তেটেকতা গদিঘেনে I

একাদশী-তাল ঃ ১১ মাত্রা

[মূল ঠেকা]

১´ ২ ৩ ৪
I ধা দেন তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে তাগে তেটে I

পরিচয়

এই তালের ১১টি মাত্রা। চারিটি বিভাগ। প্রথম বিভাগে তিনটি, দ্বিতীয় বিভাগে দুইটি, তৃতীয় বিভাগে দুইটি ও চতুর্থ বিভাগে চারিটি মাত্রা আছে। চারিটিই তাল। কোন ফাঁক নাই। প্রথম, চতুর্থ, ষষ্ঠ, ও অষ্টম মাত্রায় তাল।

একাদশী তালের দ্বিগুণ

১´ ২
I ধাদেন তাতেটে কতাগদি । ঘেনেধাগে তেটেতাগে ।

৩ ৪
তেটেধা দেনতা । তেটেকতা গদিঘেনে ধাগেতেটে তাগেতেটে I

॥ সাঙ্গীতিক পরিভাষা ॥

ধ্রুপদ

ধ্রুপদ ভারতবর্ষের এক প্রাচীন গান। যে গানের শব্দসমূহ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিলেও মূল স্বর ও তালস্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় না তাহাকে ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ বলা হয়। ধ্রুব অর্থে সত্য পদ অর্থে শব্দ। আনুমানিক ৫০০ শত বৎসর পূর্বেও ইহার প্রচলন ছিল। প্রবাদ আছে যে, ধ্রুপদ গানের আবিষ্কার গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর (১৪৮৬—১৫১৮ খৃঃ) করিয়াছেন। মানসিংহের সময় ধ্রুপদ গানের বেশ প্রচার হইয়াছিল। ইনি নিজেও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং ইঁহার নামে রচিত গান আজও ধ্রুপদ গায়কেরা গাহিয়া থাকেন। সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ধ্রুপদ গান চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। আকবরের সভায় বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য তানসেন প্রধান গায়ক ছিলেন।

হরিদাস স্বামী, নায়ক বৈজু, তানসেন, গোপাল প্রভৃতি সুবিখ্যাত ধ্রুপদ গায়কদিগের রচিত গান আজও শুনিতে পাওয়া যায়। ধ্রুপদ গান মৃদঙ্গের সহিত গাওয়া হয়। ধ্রুপদ এক গভীর প্রকৃতির গান। এই গানের বাণীতে ভাবের মাধুর্য ও কবিত্বের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। খেয়ালের সহিত তুলনায় ইহাকে জোরদার অথবা ভারতবর্ষের মর্দানা গান বলা হয়। ইহার বীর ভক্তি ও শৃঙ্গার রসে গাওয়া হয়। ধ্রুপদ গাহিবার আগে নোম্, তোম্ দ্বারা আলাপ করা হয়। ধ্রুপদে তান ব্যবহারের রীতি নাই। চৌতাল, সুলফাঁক, ব্রহ্ম, রুদ্র প্রভৃতি তালে প্রধানত বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদ গাওয়া হয় এবং দ্বিগুণ, তিগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি লয়ে কণ্ঠের কাজ করা হয়। ইহার আলাপ অত্যন্ত শুদ্ধ ও মাধুর্যপূর্ণ। ধ্রুপদ গায়কদিগকে কলাবন্ত বলিয়া সম্বোধন করা হয়। চার বাণীর ধ্রুপদ গান বিখ্যাত। যথা ঃ খাণ্ডারবাণী, ডাগুরবাণী, নওহরবাণী এবং গওহর বা গোবরহার বাণী।

ধামার

ধামার আসলে চৌদ্দ মাত্রার একটি বিষমপদী তালের নাম। প্রচলিত হোরী নামক প্রবন্ধ গান ধামার তালে গাওয়া হইলে তাহাকে ধামার বলা হয়। কলাবন্তেরা বসন্ত ঋতুতে বিশেষ করিয়া হোলী উৎসবের সময় এই গান করিতেন। এই গানে সাধারণত রাধাকৃষ্ণের দোললীলার বর্ণনা থাকে। ধ্রুপদের ন্যায় ধামারে তান ব্যবহার করা হয় না। ইহাতে মীড়, গমক ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয় এবং দ্বিগুণ, তিগুণ, চৌগুণ, আড় প্রভৃতি লয়ে বিভিন্ন সুললিত ছন্দের কাজ করা হয়। ধামার গানের পদ রচনা ধ্রুপদ অপেক্ষা লঘু প্রকৃতির হয়। কলাবন্তগণ সাধারণত ধ্রুপদ গাহিবার পর ধামার পরিবেশন করেন।

খেয়াল

খেয়ালের অর্থ স্বাধীনতা। ইহা ফার্সী শব্দ। যে গানের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে রাগবিশেষের নিয়মানুযারী বিভিন্ন স্বর সমন্বয়ে সুললিত ছন্দে বদ্ধ কবিয়া খেয়ালমত গাওয়া হয় তাহাকে খেয়াল কহে।

চতুর্দশ শতকে আলাউদ্দিন খিলজির রাজত্বকালে মহাজ্ঞানী কবি, সঙ্গীত-শিল্পী অমীর খসরু তুনী খেয়াল সৃষ্টি করেন। ইহা ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, প্রভৃতি তালে গাওয়া হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কী সর্বপ্রথম বিলম্বিত খেয়ালের প্রবর্তন করেন। ইহা একতাল, ঝুমরা, তিলুয়াড়া প্রভৃতি তালে গাওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীণকার নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ নামে পরিচিত) কলাবন্ত পদ্ধতির খেয়াল সৃষ্টি করেন। এই খেয়ালের গায়নে বীণের মধ ও দ্রুত জোড় এর কাজ ব্যবহার করা হয়। ইহাতে একটি স্বরকে লক্ষ্য করিয়া বিস্তার করা হয় এবং বোলতান প্রয়োগ করা হয়।

আলাপ

আলাপের অর্থ হইল রাগরূপ বিস্তার। গায়ক ও বাদক কোন রাগ গাহিবার বা বাজাইবার পূর্বে ঐ রাগে ব্যবহৃত বিশেষ স্বর-সঙ্গতি দ্বারা রাগরূপকে শ্রোতাদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ইহাকে সঙ্গীতের আলাপ কহে।

আলাপে গানের পদ ব্যবহার হয় না। নেতে তোম্ প্রভৃতি শব্দ সহযোগে রাগরূপ বিস্তারকেই আলাপ বলা হয়। আলাপে তাল ব্যবহারের রীতি নাই, তবে রাগের বাদী সমবাদী বর্জিত প্রভৃতি নিয়ম রক্ষা করা হয়।

টপ্পা

টপ্পা একটি হিন্দী শব্দ। ইহার রচনা অতি সুললিত। প্রাচীনকালে পাঞ্জাবের উষ্ট্রপালকেরা অনেকটা এই প্রণালীর গান করিতেন। তৎকালে এই গানের ততটা মাধুর্য ছিল না। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌয়ের শোরী মিঞা এই গীত রচনার সংস্কার করিয়া সভ্য-সমাজে প্রচার করেন। এই গানের রচনা পাঞ্জাবী শব্দবহুল। ইহার প্রকৃতি চঞ্চল। শৃঙ্গার রসই ইহার প্রধান উপজীব্য। ইহাতে স্থায়ী ও অন্তরা দুইটি ভাগ বা তুক্ থাকে। কাফী, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়াঁ প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির রাগ টপ্পার পক্ষে প্রশস্ত।

ঠুংরী

ঠুংরী ভাবপ্রধান গান। এই গানে রাগের বিশুদ্ধতার অপেক্ষা ভাবের মহত্ব বেশী দেওয়া হয়। সম্ভবত খেয়ালের বিস্তারকালে নানাপ্রকার সুললিত স্বর সংযোগ এবং অলঙ্কার ব্যবহার হইতে ঠুংরী গানের উদ্ভব হয়। ঠুংরীর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, তবে শোনা যায় লক্ষ্ণৌয়ের সাদিক আলি ইহার জন্মদাতা। তারপর কদরপিয়া, ললনপিয়া, অখতরপিয়া প্রভৃতি অনেকে ঠুংরী গান রচনা করেন। ইহা প্রধানত ভৈরবী, পিলু, খাম্বাজ, কাফী প্রভৃতি রাগে, পাঞ্জাবী, যৎ, আর্ধা প্রভৃতি তালের সহিত গাওয়া হয়। লক্ষ্ণৌ এবং বারাণসীর ঠুংরী অতি শ্রুতিমধুর ও লোকপ্রিয়। ঠুংরী সাধারণত শৃঙ্গার রসযুক্ত ক্ষুদ্র আকারের গান। ইহা চপলতা বর্জিত। নানাপ্রকার বোল-বিন্যাসের দ্বারা ঠুংরীতে ভাবপ্রকাশ করা হয়। লক্ষ্ণৌ ও বেনারসে পূর্বী অঙ্গের ঠুংরী গাওয়া হয়। পাঞ্জাবী ঠুংরীতে টপ্পার প্রভাব অধিক।

চৈতী

বিহার প্রদেশের লোকগীতিগুলির মধ্যে চৈতী প্রধানতম। ইহা চৈত্র

মাসের গান। গানগুলি বিরহ বিষয়ক এবং শৃঙ্গার রসাত্মক। রামসীতার লীলা বর্ণনাই চৈতী গানের প্রধান উপজীব্য।

চতুরঙ্গ

চারি অঙ্গের সংমিশ্রণে এই গীতের রচনা হয় বলিয়া ইহাকে চতুরঙ্গ গীত বলা হয়। এই গীতে চারিটি অবয়ব থাকে। যেমন প্রথম ভাগে গীতের বাণী বা অর্থযুক্ত কিছু পদ বা পদাংশ, দ্বিতীয় ভাগে তারানার বাণী, তৃতীয় ভাগে রাগের স্বরগম ও চতুর্থ ভাগে থাকে পাখোয়াজের বোল বা বাণী।

তারানা

কতকগুলি অর্থহীন শব্দ দ্বারা এই গীত রচিত হয়। যেমন—তোম্, তানা, না, তু, দির দির, তদীয়ন, রেদানী, উদানী, তদানী ইত্যাদি। এই রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে তবলা ও পাখোয়াজের বোল থাকে। তারানা গাহিবার পদ্ধতি খেয়ালের মতই। ইহা সাধারণত ত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল প্রভৃতি তালে দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। তারানাতে দ্রুত তান প্রয়োগ করা হয়। ইহাতে সাধারণত দুইটি তুক বা অবয়ব থাকে, যেমন—স্থায়ী ও অন্তরা। খেয়াল গায়কেরা ছোট খেয়াল গাহিবার পর তারানা গাহিয়া থাকেন। তারানার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল তৈয়ারী, লয়কারী ও উচ্চারণ অভ্যাস।

হোরী

বসন্ত ঋতুতে রাধাকৃষ্ণের দোললীলা উপলক্ষে রচিত গানগুলিকে হোরী বলা হয়। এই গানগুলি শৃঙ্গার রসাত্মক। পূর্বে এই গানগুলি ধামার তালে গাওয়া হইত। এইজন্য ধামার বলিতে অনেকেই হোরী গানকেই বুঝিতেন। বর্তমানে দীপচন্দি তালেও ঠুংরীর ঢংয়ে হোরী গাওয়া হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রসঙ্গীত

যে গানের কথা এবং সুর উভয়েই রবীন্দ্রনাথের রচনা তাহাই রবীন্দ্রসঙ্গীত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু রচনায় অন্যেরাও সুর সংযোগ করিয়াছেন, এইগুলিও বর্তমানে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলিয়া পরিচিত হইতেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের

একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে কথা এবং সুরের প্রাধান্য বহু গীত হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর আশ্রয়ে রচিত হইলেও তানকর্তব এবং লয়কারির চাতুর্য বর্জিত। গানের ভাব ও সুরের পারস্পরিক মিলনে শান্ত মাধুর্য্যের সঞ্চার রবীন্দ্রসঙ্গীতকে এক পৃথক মর্যাদা দান করিয়াছে।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য ॥

রবীন্দ্রসঙ্গীতেব গীতপদ্ধতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল কথার উচ্চারণ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথাই ভাবের প্রবক্তা, সুর সেই ভাবকে জীবন্ত করিয়া তোলে। কথাগুলিকে গানের মধ্যে এক বিশেষ কার্য-সাধন করিতে হয়। প্রথমত কথার উচ্চারণে তাহার অর্থ ও ভাব সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গায়কের সুরের প্রতি দৃষ্টি এত নিবিষ্ট থাকে যে, কথাগুলির উচ্চারণের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না—অর্থাৎ তাহাদের 'অর্থ-প্রকাশক' রূপে উচ্চারণ করা হয় না। আর একটি দোষণীয় জিনিষ হইল উচ্চারণে বিকৃতি ঘটানো, কোন না কোন Mannerism প্রকাশ করা। এই ত্রুটিগুলি হয় কতকগুলি ইচ্ছাকৃত আবার কতকগুলি হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার উচ্চারণ কেমন হওয়া উচিত তাহা না জানার দরুণ।

অযথা কোন শব্দ চাপিয়া উচ্চারণ করা, ঘষিয়া উচ্চারণ করা, দীর্ঘনিঃশ্বাস টানা বা ফেলার সঙ্গে উচ্চারণ করা—যাহাতে চেষ্টা করা হয় বিষাদভাব জাগাইবার জন্য কান্নার ভঙ্গীতে, নাকি সুরে কোন স্বরবর্ণের বিকৃতি ঘটাইয়া উচ্চারণ এ সবই রবীন্দ্রসঙ্গীত গীতবিরুদ্ধ। যেমন—'যে ছিল আমার স্বপনচারিণী'—এই কথাগুলি গাহিবার কালে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারণ করা উচিত। কিন্তু যদি গাওয়া হয়—য্‌যে ছি-ল আমার স্‌স্‌স্বপন চারিণী—আর যদি কণ্ঠ কম্পিত করা হয় তাহা হইলে ভাবাবেগ উদ্রেকের পরিবর্তে অত্যন্ত

বিকৃত শুনাইবে। উচ্চারণের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল স্বরযুক্ত বর্ণ বা হসন্ত-বিহীন বর্ণ যেমন ব্যবহার হয় ঠিক তেমনি ব্যবহার করা উচিত। অ-কারগুলি ও-কার করিয়া আমরা কথা বলিলেও গানের উচ্চারণে অ-কারই রাখা প্রয়োজন।

'আমার মল্লিকাবনে' গানটিতে সাধারণত উচ্চারণ হয় মল্‌-লিকা, কিন্তু হওয়া উচিত ম-ল্লিকা।' 'ল' এর দ্বিত্ব ভাঙিয়া একটি 'ল', 'ম' এর সহিত যুক্ত হইয়া যায়। ইহাকে সহজেই অন্যভাবে বিযুক্ত করিয়া গাওয়া হয়। আবার—

'মধু গন্‌-ধে ভরা, মৃদু স্নিগ্‌ধ ছায়া নীপ কুন্‌জ তলে
শ্যাম কান্‌তি ময়ী···
ফিরে রক্‌ত অলক্‌-তক ধৌত পায়ে
ধারা শিক্‌ত বায়ে।'

এখানে গ-ন্‌ধে, স্নি-গ্‌ধ, কু-ন্‌জ, কা-ন্‌তি, র-কত, অল-কৃত, সি-কৃত এইভাবে প্রথমের অক্ষরটির উচ্চারণ দীর্ঘায়িত করিয়া হসন্তের উচ্চারণ মৃদু করিতে হয়। অনেক শব্দের শেষ বর্ণ হসন্তযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিলেও হসন্তের উচ্চারণ একেবারে শেষে ফোটান দরকার। আগের স্বরযুক্ত বর্ণটি তখন দীর্ঘ করিতে হয়। কিন্তু অনেক সময় তাহার বিপরীত হইয়া যায়। যেমন—'রিমঝিম রিমঝিম' গাহিবার সময় রিমিঝিম্‌ম্‌ম্‌—শেষের হসন্তযুক্ত 'ম্‌' খুব প্রখর শুনায়।

কোথাও কোথাও 'এ' অক্ষরটি পুরাপুরি 'এ'-র মতই উচ্চারণ করা হয়। যেমন—'তুমি যেয়োনা এখনি'-তে আমাদের কথা বলিবার মত 'অ্যাখনি' হইবে না। আবার 'আমার মল্লিকাবনে' গানটিতে 'এখনো বনের গান বন্ধু, হয় নি তো অবসান তবু এখনি যাবে কি চলি' প্রথমটি অ্যাখনো হইবে কিন্তু দ্বিতীয়টি 'এখনি'—'অ্যাখনি' নয়।

উচ্চারণ সম্বন্ধে জানিবার আর একটি বিষয় হইল, কৃত্রিমভাবে কখনো গলা কাঁপানো উচিত নয়। স্বাভাবিকভাবে গলায় যে মৃদু কম্পন—যেমন কীর্তন বা

লোকসঙ্গীতের গানে বৈশিষ্ট্য দেয়—তাহা খুব স্বাভাবিকভাবে কোথাও আসিয়া যাইতে পারে। কিন্তু গানের effect সৃষ্টির জন্য গলা কাঁপানো একটি বিশেষ দোষ।

আজি বরিষণ মুখরিত শ্রাবণরাতি
স্মৃতিবেদনার মালা একেলা গাঁথি।

এই কথাগুলিতে একটি একাকীত্বের নিঃশব্দ অভিনিবেশ ভরিয়া আছে। গায়ক যদি 'রাতি', 'মালা' এগুলির শেষে গলা কাঁপাইতে শুরু করেন, তাহা হইলে ঐ একাকীত্ব, স্মৃতি, শ্রাবণের বর্ষণে যাহা আকুলিত হইয়া উঠে—এই ভাবের নাগাল আর মন পায় না। বাণী চাপা পড়িয়া যায়, কেবল গলা কাঁপানোর আওয়াজই শোনা যায়।

নিজেকে জাহির করিবার জন্য—কথার উচ্চারণ আর সুর যেন কখনও একে অপরকে ত্যাগ না করে। এই কথাটি সব সময় মনে রাখিতে হইবে। যেমন জলে সাঁতার কটিতে যাইয়া অপটু সাঁতারু যত না সাঁতার কাটে তাহা অপেক্ষা বেশী হাত পা ছোঁড়ে, জল ছিটায়, আশেপাশের জীবদের বিরক্তি উৎপাদন করে। কিন্তু যে উত্তম সাঁতারু সে জলের মধ্য দিয়া তর তর করিয়া আগাইয়া যায়। না একটু জল ছিটকায় না একটুও জলকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। এইটাই হইল গানের আর্ট। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কখনও শ্রোতা অনুভব না করেন যে তিনি কেবল কথাগুলি শুনিতেছেন বা কেবল সুর শুনিতেছেন। তাঁহাদের মনে হওয়া উচিত ভাবময় একটি কথার সুরই শুনিতেছেন যাহা তাঁহার ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করিয়া অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পর্দায় আঘাত হানিতেছে। তাঁহার ভাবমানসে সূক্ষ্ম বোধগুলি জাগিয়া উঠিয়া আর একটি সুগভীর আনন্দস্বাদ বহন করিয়া আনিতেছে।

যে গানগুলিতে মীড়ের ব্যবহার বেশী সেগুলিতে কথার উচ্চারণে একটু অস্পষ্টতা ফোটে—সেখানে গায়কের একটু সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

॥ রবীন্দ্রনাথের গুরু পরম্পরা ॥

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতজীবনের প্রথম গুরু ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তী। ইঁহারই নিকট গুরুদেবের ভারতীয় সঙ্গীতে প্রথম হাতে-খড়ি হয়। বিষ্ণু ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহার নিকট রাগসঙ্গীত শিক্ষা করিতেন। এই বিষ্ণু ছিলেন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীত শিক্ষক।

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতপ্রীতির জন্য ঠাকুর পরিবারে অনেক বিখ্যাত গায়কের স্থান হইয়াছিল এবং ইঁহাদের মধ্যে যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার এই সকল শিল্পীরা ছাড়া বরোদার বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুকাল ঠাকুর বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠ সিংহ নামে আর একজন গায়ক ছিলেন যাহার প্রভাব ঠাকুর পরিবারে যথেষ্ট ছিল। ইনি ছিলেন মহর্ষির বন্ধু। এই শ্রীকণ্ঠ সিংহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠ বাবুর প্রিয়শিষ্য ছিলাম। তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জান্‌তে পারতুম না। তাঁহার একটা গান ছিল—'ময়্ ছোঁড়ো ব্রজকি বাসরী।' ওই গানটি আমার মুখে সকলকে শোনাইবার জন্য তিনি আমাকে ঘরে ঘরে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেন। আমি গান ধরিতাম, তিনি সেতারে ঝঙ্কার দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতগুরুদের মধ্যে যদুভট্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সৃষ্টিধর্মী সঙ্গীতপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। যদুভট্টের প্রতি গুরুদেবের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই ওস্তাদের সম্বন্ধে গুরুদেব নিজেই বলিয়াছেন—"ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী

দারোয়ানের মত তাল-ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনিই বিখ্যাত যদুভট্ট। বাংলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটা Originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"

রাধিকা গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্র ছিলেন ঠাকুর পরিবারের শেষ সঙ্গীত শিক্ষক। ইহা ছাড়া আরো অনেক গুণী ও ওস্তাদ ঠাকুর পরিবারে গায়ক হিসাবে স্থান পাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র রায় ও মৌলাবক্সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরলিপি ও শিল্পীর স্বতন্ত্রতা ॥

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরলিপি অপরিহার্য। সঙ্গীত বিশেষভাবেই গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাগ্রহণ যে সর্বাধিক প্রশস্ত তাহার দ্বিমত নাই। তবুও স্বরলিপির উপযোগিতা আছে। কোন মহান শিল্পীর মৃত্যুর পর তাঁহার সৃষ্টি ও সঙ্গীত লিপিবদ্ধ না থাকায় এবং উপযুক্ত সমপ্রতিভাবান শিষ্য না থাকিলে ঐ সৃষ্টির অনেকাংশই বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইভাবে প্রাচীন ভারতের কত গান যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক ক্ষেত্রে গানের কথা অংশ পাওয়া যায় কিন্তু স্বরলিপির অভাবে জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না গানটি কিভাবে গাহিতে হইবে। এইখানেই স্বরলিপির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য প্রতিপন্ন হয়। স্বরলিপির সাহায্যে নির্দিষ্ট গানটির ছন্দ, সুর ও তাল সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়। স্বরলিপি থাকিলে গানের যথাযথ সুরটি বিস্মৃত হইবার আশঙ্কা থাকে না। রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাণী ও সুরের অপূর্ব সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। স্বরলিপির মাধ্যমে বাণীর বাহন সুরগুলিকে অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করিবার একটা সযত্ন প্রচেষ্টা থাকে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানের স্বরলিপি রচনার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

নূতন গান রচনা করিয়া তিনি গাহিয়া শুনাইবার পরই তাহার স্বরলিপি তৈয়ারী করিবার জন্য নির্দেশ দিতেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বরলিপিকারগণ বিভিন্ন যুগে তাঁহার গানের স্বরলিপি করিয়াছেন ; এবং দেখা যায় যে এই নানা স্বরলিপি সমষ্টির মধ্যে নানা অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্য, স্পর্শস্বর, খোঁচ, মীড়, গমক ইত্যাদি প্রয়োগ করা হইয়াছে নানা ভাবে। রবীন্দ্রনাথ স্বরলিপি সম্পর্কে অন্যের উপর ভার দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেন। ফলে এই নানা তারতম্যযুক্ত স্বরলিপিগুলির মধ্যে একটি সাধারণ গায়কিকে মানদণ্ডরূপে নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন আজ অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

সঙ্গীত সংরক্ষণের জন্য স্বরলিপির গুরুত্ব অপরিসীম হইলেও কেবলমাত্র স্বরলিপির সাহায্যে সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ব করা যায় না। বর্তমানে স্বরলিপি চর্চা অনেক বাড়িয়াছে। আজিকার শিল্পীরাও স্বরলিপি সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন। খুবই ভাল কথা। তাহাতে অন্তত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অতিপ্রচারে ভীত হইবার কারণ থাকে না কারণ এই স্বরলিপিচর্চা শিল্পীর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আস্থা জাগায়। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বরলিপির এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মানিয়া লইলেও সার্থক সঙ্গীতসৃষ্টির ক্ষেত্রে কোথায় যেন একটু ফাঁক থাকিয়া যায়। স্বরলিপিতে গানের কাঠামোটুকু থাকে হৃদয় থাকে না। অত্যধিক স্বরলিপি নির্ভরতা গানকে যদি নিছক অঙ্কে পর্যবসিত করিয়া তোলে তাহা হইলে গানের সে ভবিষ্যৎ খুব সুখকর হইবে না। তাই প্রকৃত শিল্পীকে, তিনি যে সঙ্গীতেরই পূজারী হউন, স্বরলিপির ইষ্টকাষ্ঠের বেষ্টনি অতিক্রম করিয়া গানের মর্মস্থলে পৌছিবার মত অনুভূতিশীল মন এবং অন্তদৃষ্টি লাভ করিতে হইবে। বিভিন্ন ধরনের সঙ্গীতের গায়কির বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিবার সাধনা শিল্পীর এক মহৎ কর্তব্য—তাহা ভীরুতা অথবা অজ্ঞতা নয়।

আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বাধীনতা নাই—স্বরলিপির নিয়মাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সে গান। কিন্তু জীবনের কোন ক্ষেত্রেই পুঁথিগত বিদ্যাকে ব্যবহারিক

জীবনে প্রয়োগ করিতে যেমন বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার প্রয়োজন—স্বরলিপিতে বাঁধা গানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তেমনই রসজ্ঞান, পরিমিতিজ্ঞান এবং সর্বোপরি প্রতিভার প্রয়োজন আছে বৈকি। এখানেই তো উপলব্ধি হয় যে কে প্রকৃত শিল্পী আর কে ভাল গায়ক। স্বরলিপিতে যে কয়টি বস্তু পাওয়া যায় তাহা হইল গানের বাণী, ছন্দ এবং সুর। আসল যে বস্তুটি তাহা কোথাও নির্দেশিত থাকে না—তাহা হইল গানের প্রাণ তথা গানের ভাবরূপ। সেই আসল বস্তুটিকে খুঁজিয়া বাহির করা কি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর স্বাধীনতা নয়? স্বরলিপির বদ্ধ পাপড়ি একটি একটি করিয়া খুলিয়া রঙে রসে গন্ধে নিজেকে বিলীন করিয়া দেওয়া—তাহার মূল্যই কি কম?

গানের বিকৃতি রবীন্দ্রনাথের নিকট অসহনীয় ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ একবার গীতালীর উদ্বোধনী ভাষণে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের কাছে আমার মিনতি, তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান বলে চিনতে পারি। এখন এমন মনে হয় যে আমার গান শুনে নিজের গান কিনা বুঝতে পারি না। মনে হয় কথাটা আমার, সুরটা যেন নয়। নিজে রচনা করলুম, অপরের মুখে নষ্ট হচ্ছে এ যেন অসহ্য। মেয়েকে অপাত্রে দিলে যেমন সব কিছু সইতে হয়, এও যেন আমার পক্ষে সেই রকম। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।"

বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের গানের প্রচার বাড়িয়াছে তাহা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু শ্রোতার রুচির মানও সেই সঙ্গে যাহাতে উন্নততর হয় তাহার দায়িত্ব শিল্পীর। শ্রোতার রুচি অনুযায়ী গান পরিবেশিত হইবে না—রুচিবান শিল্পী তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনা এবং আনন্দের নির্ঝরিণীতে শ্রোতাকে যদি অবগাহন করাতে না পারেন—সে ত্রুটি শিল্পীর। যেদিন শিল্পী এবং শ্রোতার রুচির মান এক হইয়া উঠিবে সেইদিনই শিল্পীর সঙ্গীতসৃষ্টি সার্থকতা লাভ করিবে।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তন ও বাউল গানের প্রভাব ॥

রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তনের প্রভাব ঃ

রবীন্দ্রনাথ কীর্তন গানের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—"কীর্তন সঙ্গীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাব প্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর-কোনো সঙ্গীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সঙ্গীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তন সঙ্গীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি। …কখনো কখনো কীর্তনে ভৈঁরো প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু তার মেজাজ গেছে বদলে—রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক।"

রবীন্দ্রনাথ বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারী সব সুরকেই তিনি তাঁহার গভীরতম কথার বাহন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে তাহাদের মধ্যে বেশী সংখ্যক গান পাই কীর্তন ও বাউল এই দুটির মিশ্রিত সুরে। কীর্তন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন ঃ "কীর্তন জীবনের রসলীলার সঙ্গে সঙ্গীতের রসলীলা ঘনিষ্ঠভাবে সম্মিলিত।" আবার বলিয়াছেন—"কীর্তন হচ্ছে রত্নমালা রূপসীর গলায়। যে জন রসিক প্রত্যেক রত্নটিকে প্রিয় কণ্ঠে স্বতন্ত্র করে সে দেখতে পায় না—দেখতে চায় না। রত্নগুলিকে আত্মসাৎ করে সে সমগ্র রূপটি নানা-ভাবে হিল্লোলিত সেইটিই তার দেখবার বিষয়।"

কীর্তনের যে দিকটি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল সে তাহার সুরে এবং কথায় সম্মিলিত "অর্ধনারীশ্বর রূপ"। তিনি বলিয়াছেন—"বাণীর প্রতি বাঙালীর অন্তরের টান। সেইজন্য ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশী হয়েছে। কিন্তু বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের

সম্পূর্ণতা হয় না, এইজন্য বাংলাদেশে সঙ্গীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয় বাণীর পাশেই তার আসন।" ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি কীর্তনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন— "কীর্তন অপরূপ সঙ্গীত, যুগল ভাবে গড়া পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা, পদাবলীর সঙ্গেই তার রাসলীলা, স্বাতন্ত্র্য সে সইতে পারে না" রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল কথাও তাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কীর্তনাঙ্গ গানগুলিতে একদিকে যেমন প্রাচীন ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছেন তেমনি অন্য দিকে তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কীর্তন গানের আখর একটি বিশেষ অঙ্গ। একটি চরণ বা চরণাংশের ভাব প্রকাশের জন্য শব্দান্তরে ও সুরান্তরে যে চরণ বা চরণাংশ যোগ করা হয় তাহাকে আখর বলা হয়। কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটি আখরযুক্ত ও অপরটি আখরহীন। পদাবলী কীর্তন গানে প্রচলিত আখরকে তিনি তাঁহার কীর্তনাঙ্গ গানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি উপাসনার গানে এই আখরের প্রয়োগ দেখা যায়। কয়েকটি আখরযুক্ত কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত। যেমন—

[১] গান

ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ,
আমি মর্মের কথা অন্তরব্যথা কিছুই নাহি কব—
শুধু জীবন মন চরণে দিনু বুঝিয়া লহ সব।

আখর

দিনু চরণ তলে· · ···
কথা যা ছিল দিনু চরণতলে··· ···
প্রাণের বোঝা বুঝে লও দিনু চরণতলে··· ইত্যাদি—

[২] গান

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথপানে, কত বাধা পায় পায় হে॥

আখর

তোমার অমৃত পথে… ..

যে পথে তোমার আলো জলে সেই অভয় পথে… ইত্যাদি—

[৩] গান

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না ?

কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না ?

আখর

মোহ মেঘে তোমারে দেখিতে দেয় না……

মোহ মেঘে তোমারে অন্ধকারে রাখে……

তোমারে দেখিতে দেয় না …. ইত্যাদি—

এই তিনখানি গান ছাড়াও 'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু', 'কে জানিত তুমি ডাকিবে আমারে', 'তুমি কাছে নাই বলে', 'নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে' প্রভৃতি গানগুলিও আখরযুক্ত কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। আখরকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন "কথার তান"। গানের ভাবটিকে ব্যক্ত করাই কীর্তনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয় আখরের রীতি আপনা হইতেই কীর্তনে প্রবেশ করিয়াছিল। তালের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, কীর্তনে তিনি গরাণহাটি বা মনোহরসাহী কীর্তনে প্রচলিত কঠিন তাল একেবারেই ব্যবহার করেন নাই বলা চলে। সাধারণ ছয় মাত্রা, সাত মাত্রা, আট মাত্রা, দশ মাত্রার সহজ তালকেই তিনি বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। তালফেরতা তালটি যাহা সাধারণ কীর্তন গানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তিনি তাহাকেও পরিহার করিয়াছেন।

আখরহীন কীর্তনাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। তাহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যেগুলি কীর্তনের সুর বলিয়া মনে হয়। আবার কতকগুলি গান আছে যেগুলিতে সুরের মিশ্রণ থাকিলেও সে গানগুলি কীর্তনভঙ্গিম। যেমন—

কীর্তনাঙ্গ ও কীর্তনভঙ্গিম রবীন্দ্রসঙ্গীত

পূজা পর্যায়ের : "আমি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ।"
"আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর।"
"আমি যখন ছিলেন অন্ধ।" ইত্যাদি—

প্রেম পর্যায়ের ঃ "আমার মন মানে না দিনরজনী।"
"না চাহিলে যারে পাওয়া যায়।"
"ভালোবেসে, সখি, নিভৃত যতনে।" ইত্যাদি—

প্রকৃতি পর্যায়ের ঃ "আমার মল্লিকাবনে।"
"আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে।"
"তোমরা যা বলো তাই বলো।" ইত্যাদি—

রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ গানের কোন কোন ক্ষেত্রে একই গানে শুদ্ধ ধৈবত ও কোমল ধৈবত এবং নিষাদের প্রয়োগ রাবীন্দ্রিক কীর্তনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন : 'তবু মনে রেখো', 'আজি শরততপনে', 'আমার মল্লিকাবনে', 'তোমরা যা বলো', 'ফাগুনের শুরু হতেই' ইত্যাদি গানে।

কীর্তনের মধ্যে যে নাট্য রসের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার দুই একটি নাট্যের বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টির কাজে বিশেষভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি গানের কথা মনে হয়। প্রথমটি "সখী বহে গেলো বেলা" গানটি মায়ার খেলা গীতিনাট্যের তৃতীয় দৃশ্যে স্থান পাইয়াছে। প্রমদা যখন সখীদের সাথে প্রমোদে মত্ত সেই আনন্দগীত উচ্ছল মুহূর্তে হঠাৎ একটি সখীর মুখে এই সহজ কীর্তনের সুরের গানটি এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করে যে তখন শ্রোতাদের মনকে পূর্ব মুহূর্তের হাল্কা পরিবেশ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া একটি ভাবগম্ভীর রাজ্যে আনিয়া দেয়। দ্বিতীয় গানটি 'রোদন ভরা এ বসন্ত'। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে অর্জুনের প্রত্যাখ্যানের পর চিত্রাঙ্গদার মুখে "রোদন ভরা এ বসন্ত" গানটি কথায় ও সুরে একটি করুণ রসের সৃষ্টি করে। 'কিংশুক রক্তিম রাগে' রঞ্জিত চিত্রাঙ্গদার বিরহ বেদনাটি কীর্তনের সুরের সহিত একাত্ম হইয়া

অব্যক্ত গভীরতায় মূর্ত হইয়া উঠে। বানী ও সুরের মিলিত অর্ধনারীশ্বরের রূপ সৃষ্টি ছিল তাঁহার সাধনা। যতই তাঁহার প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছে তাঁহার সাধনা ততই নূতনতর সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাউলের প্রভাব ঃ

বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের মধ্যে বাউল গান অন্যতম। বাউল গান দেহতত্ত্ব বিষয়ক। বাউলেরা জীবন সাধনকে প্রেমের সাধনারূপে গ্রহণ করে। বাউলদের সাধনা 'অধর মানুষ'কে ধরিবার বিশেষ সাধনা। তাহারা মনে করে যে, দেহকে অবলম্বন করিয়াই কামের মধ্য দিয়াই প্রেমে উত্তীর্ণ হইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে বাউল গানের প্রভাব কীর্তনের মত ততটা ব্যাপক নহে। রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে বাউল গানের ভাবকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ "আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানেই অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ জমিদারি দেখাশোনার কাজে রবীন্দ্রনাথকে শিলাইদহে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে পদ্মানদীর নিকটবর্তী গ্রাম্যজীবনের সহিত রবীন্দ্রনাথের নিবিড় পরিচয় হয়। এই পরিচিতির সুফল একদিকে যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যে, অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রসঙ্গীত চিরভাস্বর হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত লালন ফকিরের ঘনিষ্টতার কথা অনেকেই জানেন। বাউল মনের অন্তস্থলে যে সত্যটি অবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহার কণ্ঠে গীত গানে সহজ ভাষায় সহজ সুরে-তালে সেই সত্যটির পরিচয় পাওয়া যায়। এমন একটি বাউল গান—

"আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥"

রবীন্দ্রনাথ এই গানটির সুর ও তাল অবলম্বনে 'আমার সোনার বাংলা

আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রচনা করিয়াছিলেন। 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে একলা নিতাই রে' গানটি অবলম্বনে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' এই স্বদেশ পর্যায়ের গানটি উল্লেখযোগ্য। প্রধানত দেহতত্ত্ব বিষয়ক বাউল গানের সুরকে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিভিন্ন পর্যায়ের গানে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৩১২ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত স্বদেশ পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। জনসাধারণকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তৎকালীন অধিকাংশ স্বদেশী সঙ্গীত রচনায় সহজে গ্রহণযোগ্য বাউল সুর প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

পর্যায়ভেদে কয়েকটি বাউল সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত—

পূজা পর্যায়ঃ আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে।
আমি কান পেতে রই।
ভেঙে মোর ঘরের চাবি।

প্রেম পর্যায়ঃ ডাকব না, ডাকব না অমন করে।
যা ছিলো কালো ধলো।

প্রকৃতি পর্যায়ঃ আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়।
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে।
ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান।

স্বদেশ পর্যায়ঃ ও আমার দেশের মাটি।
তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে।
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক।

বিচিত্র পর্যায়ঃ গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ।
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন।
আমার নাইবা হল পারে যাওয়া।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল ও স্বরের সৃজন প্রতিভার আলোচনা ॥

রবীন্দ্রসঙ্গীত যেহেতু সুরসম্মিলিত কাব্য তাই তালের স্থান সেখানে কাব্যের ছন্দের সহিত বোঝাপড়া করিয়া চলে। কবি বলিয়াছেন, "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে, তাল সেই নিয়মে গানে চলবে।" কবির মতে "ছন্দকে মোটের উপর তিন ভাগে ভাগ করাযায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষমচলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলে সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলে অসম-মাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার ছন্দকে বলে বিষমমাত্রার চলন।···"দুই মাত্রার চলন ক্ষিপ্র, তিন মাত্রার চঞ্চল, চার মাত্রার মন্থর, আট মাত্রার গম্ভীর।·· তিনের মাত্রাটা টলটলে, গড়িয়ে যাবার দিকে তার ঝোঁক"। কোনো কোনো তালে মাত্রার পূর্ণসংখ্যা অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব তাহার ভিতরের মাত্রা বিন্যাসের উপর বর্ত্তায়। কবির কথায় "প্রদক্ষিণের মাত্রার চেয়ে পদক্ষেপের মাত্রার পরেই ছন্দের বিশেষত্ব।" ····"এক হচ্ছে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ক'টি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্ছে সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ।" এই তিন মাত্রার তালের কোন কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার অংশে এত দৌরাত্ম্য যে কথার অক্ষরগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। যেমন "আজি বিজন ঘরে" গানটিতে "তোমার পরশ থাকুক আমার হৃদয় ভরা" অংশে 'পরশ' ও 'হৃদয়' এই দুইটি কথার প্রতিটি এক মাত্রা করিয়া ছোট হইয়া যাইতে চাহে—তাহাতে কথার ভাব কমিয়া যায়।

তালের কথায় রবীন্দ্রনাথের আর একটি বিশেষ অভিমতকেও তাঁহার গানের ক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কবির মতে, "তালও ভাবপ্রকাশের একটি অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়। উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক—সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাব

প্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভাল হয়। ···**এই সকল** ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সঙ্গীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়। সেটা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরও কড়াক্কড় করা ভাল বোধ হয় না।"

রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনেক গান আড়ছন্দে রচিত। গানগুলি অপূর্ব সাবলীল ঢংয়ে আড়ে পা ফেলিয়া অনায়াসে আগাইয়া চলে। সেই যেন একটু দ্বিধাগ্রস্থ পদক্ষেপ, গানের মাধুর্যকে তীব্র করিয়া তোলে। রবীন্দ্রনাথ কী সুন্দর ভঙ্গীতে এই আড়ছন্দের গানগুলি রচনা করিয়াছেন তাহা যাহারা তাঁহার "যারা কাছে আছে, তারা কাছে থাক", "পূর্ণ চাঁদের মায়া" এবং সম্পূর্ণ অন্য রসের গান "দেখা না দেখায় মেশা" এই গানগুলি শুনিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভাবের ও কাব্যছন্দের সঙ্গে সুরের সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে কবি অনেকগুলি নূতন তালের সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

ঝম্পক ঃ

এই তালটি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি। ইহার মাত্রা সংখ্যা-৫। ৩।২ মাত্রার ছন্দ।

		১´				২´	
তবলার ঠেকা ঃ	I	ধি	ধি	না	।	ধি	না I

গান ঃ এই লভিনু সঙ্গ তব।
বিপদে মোরে রক্ষা কর। ইত্যাদি

ষষ্ঠী ঃ

দক্ষিণ ভারতীয় গানে প্রচলিত ছয় মাত্রার পত্তিতাল এর অনুরূপ ষষ্ঠী তালের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মাত্রা সংখ্যা-৬। ২।৪ মাত্রার ছন্দ।

		১´			২			
তবলার ঠেকা ঃ	I	ধা	গে	।	ধা	গে	ধি	না I

গান ঃ **শ্যামল ছায়া নাইবা গেলে।**
নিদ্রাহারা রাতের এ গান। ইত্যাদি।

রূপকড়া :

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত ৮ মাত্রার 'সারতাল' এর অনুরূপ রূপকড়া তালের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মাত্রা সংখ্যা-৮। ৩।২।৩ মাত্রার ছন্দ।

১´ ২ ৩
তবলার ঠেকা : I ধি ধি না । ধি না । ধি ধি না I

গান : গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে।
শরৎ আলোর কমল বনে। ইত্যাদি।

নবতাল :

নয় মাত্রার তাল তিন-চার রকমে ভাগ করিয়া গুরুদেব কয়েকটি গান রচনা করিয়াছিলেন। এই তালের নাম দিয়াছেন নবতাল। ইহার মাত্রা সংখ্যা-৯। ৩।২।২।২ মাত্রার ছন্দ।

পাখোয়াজের ঠেকা :

১´ ২ ৩ ৪
I ধা দেন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে I

গান : নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা।
প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে। ইত্যাদি।

একাদশী :

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত এগারো মাত্রার 'মণিতালের' অনুকরণে একাদশী তালের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার মাত্রা সংখ্যা-১১। ৩।২।২।৪ মাত্রার ছন্দ।

পাখোয়াজের ঠেকা :

১´ ২ ৩ ৪
I ধা দেন্ তা । তেটে কতা । গদি ঘেনে । ধাগে তেটে তাগে তেটে I

গান : দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া।

নবপঞ্চ :

তালের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আর একটি মৌলিক অবদান নবপঞ্চ তাল। ইহার মাত্রা সংখ্যা—১৮। ২।৪।৪।৪।৪ মাত্রার ছন্দ।

পাখোয়াজের ঠেকা :

১´ ২ ৩

I ধা ধা । ধাগে তেটে দেন্ তা । তাগে তেটে দেন তা ।

৪ ৫

তেটে কতা গদি ঘেনে । ধাগে তেটে তাগ তেটে I

গান : জননী, তোমার করুণ চরণখানি হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে ।

এই সকল নূতন নূতন তাল প্রবর্তন ছাড়াও প্রচলিত হিন্দুস্থানী পদ্ধতির নানা তালকে ভিন্ন ছন্দে সাজাইয়া তিনি তালের ক্ষেত্রে একজাতীয় নূতন রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন। যেমন—দশ মাত্রার প্রচলিত তাল দুইটি—ঝাঁপতাল ও সুরফাঁক তাল। ঝাঁপতাল ২।৩।২।৩ মাত্রার ছন্দ ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল' গানটি ৫।৫ মাত্রার ছন্দে রচিত। সুরফাঁক তালের প্রচলিত মাত্রার ছন্দ ২।২।২।২।২ ; কিন্তু রবীন্দ্র-রচিত সুরফাঁক তালের গানগুলির মাত্রার ছন্দোবিভাগ ৪।২।৪। গান : প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর। প্রচলিত ধামার তালের ছন্দোবিভাগ ৫।২।৩।৪ ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রচিত গানের ছন্দোবিভাগ ৩।২।২।৩।৪। গান : গরব মম হরেছে প্রভু দিয়েছে বহু লাজ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে যে সকল স্বর-বিন্যাস ব্যবহার করিয়াছেন তাহা গানের কথা বা বাণীর ভাবপ্রকাশের জন্য নিজেই রচনা করিয়াছেন। এই সকল স্বর-বিন্যাস ভারতীয় রাগরাগিণীর স্বর-বিন্যাসের সহিত কিছু কিছু মিল থাকিলেও তবুও তাহাকে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ রাগভিত্তিক সঙ্গীত বলা যায় না। সেই কারণেই শেষের দিকে গানের প্রথমে রাগ নির্দেশ করা তুলিয়া দিলেন। এই প্রসঙ্গে ইন্দিরা দেবীকে চিঠির উত্তরে লিখিলেন—"গানের কাগজে রাগ-রাগিণীর নাম নির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রাগের মধ্যে না।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্য, এই নূতন রসের সন্ধান ও তাহার রূপায়ন অজস্র ধারায় বহিতে দেখা যায়। তাঁহার গানে রাগরাগিণীর ধরনটি

প্রকট না হইয়া প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও আরও গভীর অর্থ বহন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীর মৌলিক ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছেন একেবারে অকৃত্রিম-ভাবে। ভৈঁরো, ভৈরবী, রামকেলী, টোড়ী, বেহাগ, ইমন, পরজ, ভূপালী, মল্লার ইত্যাদি রাগগুলি ব্যবহার করিয়া তাহাদের যে ভাবমূর্তি অভিব্যক্ত করিয়াছেন একটি গানের অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে তাহা চমকপ্রদ। রাগটি মানবহৃদয়ে বিশ্বহৃদয়ের যে সুর বহন করিয়া লইয়া আসে, যেন তাহারই দ্যোতক—'ভৈঁরো যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন রাত্রিশেষের নিদ্রা-বিহ্বলতা, কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি; ভৈরবী যেন সঙ্গীবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিগন্তের ক্লান্তিনিঃশ্বাস; পূরবী যেন শূন্য গৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রুমোচন।" কয়েকটি গান শুনিলেই এই উপলব্ধিগুলি কিভাবে গানগুলিতে রূপায়িত হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। যেমন, 'তোমারই নামে নয়ন মেলিনু', 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি'. 'বন্ধু রহো রহো সাথে', 'নূতন প্রাণ দাও,' 'কে ওঠে ডাকি,' 'দিন যদি হল অবসান' ইত্যাদি। শিল্পীকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে এই রাগগুলির বৈশিষ্ট্য জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ যেখানে যেরূপ রাগরাগিণীর মিশ্রণ প্রয়োজন মনে করিয়াছেন তেমনি করিয়াছেন। সময়ে সময়ে এই মিশ্রণ আশ্চর্য রকমের অভিনবত্ব গ্রহণ করিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন—'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' এই স্বল্পপরিসর গানটিতে চারিটি রাগ একই সঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে এবং আত্মগোপন করিয়া আছে—ললিত, বিভাস, যোগিয়া ও আশাবরী। প্রত্যেকের ভাবের সূক্ষ্ম পর্দাগুলি অপূর্ব সুষমায় মিলানো হইয়াছে যাহার ফলে একই সঙ্গে বিরহ ও মুক্তির পূর্ণতা জাগিয়া উঠিয়াছে। 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে' গানটি মূলত খাম্বাজ রাগিণীতে রচিত। কিন্তু 'সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে' এই পদে কোমল গান্ধার প্রয়োগে এমন সূক্ষ্ম কোমলতা আনিয়াছে যে, মনে হয় ইহা না করিলে ঐ

সৌন্দর্য কখনই ব্যক্ত হইত না। 'সঘন গহন রাত্রি' বাগেশ্রী-রাগভিত্তিক কিন্তু সেখানে বিরহিনীর অশ্রু হরণ করিয়াছে ঐ তারা'তে কোমল ধৈবতের ব্যবহার কথার ভাবকে এক সম্পূর্ণ বিবিক্ত ভাবগম্ভীরতা প্রদান করিয়াছে।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব ॥

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহাওয়া সঙ্গীতমুখর ছিল এবং এই আবহাওয়া ও পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে সহজেই সঙ্গীতমুখী করিয়া তুলিয়াছিল। কলাবন্ত ধ্রুপদ গায়কগণ বালক রবীন্দ্রনাথের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কবি নিজেই বলিয়াছেন—"তম্বুরার তারে সুর বেঁধে আলাপের ভূমিকা নিয়ে যখন বড়ো বড়ো গীত রচয়িতার ধ্রুপদ গানে গায়ক নিস্তব্ধ সভা মুখরিত করতেন, সেই ছবির সুগম্ভীর রূপ আজও আমার মনে উজ্জ্বল আছে।"

উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হইতে গুরুদেব কিভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে গুরুদেব লিখিত মূল্যবান উক্তিগুলি পাই। তিনি বলিয়াছেন—

"জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ পদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাগবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সঙ্গীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে, সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত জানে না।"

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এ বিষয়ে আর একটি উক্তি অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে

আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিষ পেয়েছি—একদিকে তার বিপুল গভীরতা; আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।" তবে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ কখনই নিছক অনুকরণ-কারী হইতে পারেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন—"এই ধ্রুপদের সৃষ্টি আগেকার চেয়ে আরো বিস্তীর্ণ হোক, আরো বহুকক্ষবিশিষ্ট হোক, তার ভিত্তিসীমার মধ্যে বহুবৈচিত্র্য ঘটুক, তাহলে সঙ্গীতে আমাদের প্রতিভা বিশ্ববিজয়ী হবে।"

বস্তুত ধ্রুপদ গানের সুগম্ভীর রূপ রবীন্দ্রনাথের ভাবঘন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনার উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের অনেকেই হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের আদর্শে বাংলা ধ্রুপদ গান রচনা করেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"(যদু ভট্ট, বিষ্ণু প্রভৃতির) গান ভাঙিয়া তখন আমি এবং বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলাম। এইরূপে ব্রহ্মসঙ্গীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী সুর ও তাল প্রবেশ কবিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অগ্রজগণের পন্থা অবলম্বন করেন। হিন্দুস্থানা ধ্রুপদের আদর্শে তিনি বাংলা ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিতে থাকেন। "রুমঝুম বরখে আজু বাদরবা পিয়া বিদেশ মোরি"—কাফী সুরফাকৃতা তালে রচিত হিন্দীগানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন—"শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে।"

সৃষ্টি বৈচিত্র্যের তাগিদেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ পরিবেশনের যে সকল নিয়ম রীতি আছে তাহা হুবহু অনুসৃত হয় নাই—যদিও মৌলিক বিষয়গুলি কথা সুর তাল ইত্যাদি সমঐতিহ্যবাহী। এইজন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে যাহাকে ধ্রুপদ বলা হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাহার পূর্ণ রূপ নাই। অতএব বর্তমানকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ রবীন্দ্রনাথের এই সকল গানকে ধ্রুপদাঙ্গ আখ্যা দিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ পরিবেশনে যেমন দ্বিগুণ, তিগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি লয়কারী প্রদর্শনের কৌশল থাকে, রবীন্দ্রনাথের

ধ্রুপদাঙ্গ গানে তাহা অনুপস্থিত। কারণ তান বাটের কৌশলে গানের পদ ভাঙচুর হইয়া অর্থের অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে গানের ভাব খর্ব হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য হইল কথা ও সুরের অর্ধনারীশ্বর সম্পর্ক।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ গানের বিষয়বস্তু সাধারণত ভগবদবিষয়, প্রকৃতিবর্ণনা, রাজবন্দনা ও রাগবর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গান অধিকাংশ ভগবদবিষয়ক পূজা পর্যায়ের অন্তর্গত।

হিন্দুস্থানী ধ্রুপদে গানের অবয়বে চারিটি কলি থাকে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ধ্রুপদাঙ্গ গানে এই চারিটি কলি—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ দেখা যায়। ইহা বিশেষভাবেই ধ্রুপদের প্রভাব। ধ্রুপদ সঙ্গীত ভারতের সুপ্রাচীন আত্মসাধনার গভীর প্রেরণা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। উপনিষদের শিক্ষায় আত্মাভরসে সিক্ত রবীন্দ্রনাথের চিত্ত এই কারণেই হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পারিবারিক পরিবেশও এই আকর্ষণ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছিল।

ধ্রুপদের তুলনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে খেয়ালের প্রভাব খুবই কম। প্রাচীন ভারতের সুসমঞ্জস ও সুসংবদ্ধ সঙ্গীতচিন্তা ধ্রুপদ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিফলিত। তাহার পর খেয়ালের যুগে চিন্তাধারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে মোড় নেয়, ফলে গানের কথার গুরুত্ব কমিয়া গিয়া সুর তথা রাগ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। গান তাহার অবয়বের বহির্ভূত বহু অলঙ্করণে সজ্জিত হইতে থাকে এবং খেয়াল ক্রমশঃ সুরপ্রধান গানরূপে প্রসার লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ কিছু সংখ্যক খেয়াল গানের আদর্শে গান রচনা করিয়াছেন। ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতেও রচয়িতার স্বকীয়তার ছাপ বিদ্যমান। যেমন একটি খেয়াল গান—

[মিঞামল্লার। ত্রিতাল (মধ্যলয়)]

বোল রে পপৈয়রা অব ঘন গরজে ॥
উন উন কর আই বদরিয়া

বরসন লাগি সদারঙ্গীলে
সঁমদ সা দামনিসি কৈঁদি চৈঁদি
মোরা জিয়রা লরজে ॥

এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন এই বিখ্যাত বর্ষাসঙ্গীতটি—

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে ॥
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে
ঝরো ঝরো নামে দিকে দিগন্তে জলধারা—
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে অশান্ত বাতাসে ॥

সুসংগতির ওজন রক্ষা করাকে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনা ও পরিবেশনের আদর্শরূপে গ্রহণ করায় তাঁহার খেয়ালাঙ্গ গানেও অলঙ্কার বাহুল্য বা অনাবশ্যক তান কর্তবের বা চতুর লয়কারীর প্রয়োগ নাই। খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতে কেন তান বোলতান পরিহার করে তাহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া কবি নিজেই বলিয়াছেন—"ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সঙ্গীতের রূপ সে রচনা করলে না, সঙ্গীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে কোনটা বড়ো কোনটা ছোট বোঝা গেল না।··· সঙ্গীতে দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। ভেদ অনুসারে সঙ্গীতের দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে ও বাংলাদেশে। কোন সন্দেহ নেই যে বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক, সহায়ক বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত। বাণী তার ছায়েবানুগতা।"

'জাগো মোহন প্যারে'—ভৈরব রাগের এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন—'মন জাগো মঙ্গললোকে অমল অমৃতময় নব আলোকে। হিন্দুস্থানী গানটির বেলায় খেয়াল গায়ক কথার অংশকে নানা স্বর-বিন্যাস, বোলতানের সাহায্যে নানাভাবে ভৈরব রাগকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানটির বেলায় তাহা করা যায় না। কারণ গানটির কাব্যাংশ ভৈরব রাগের স্বরের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যুষের একটা বিশ্ব-জাগতিক ভাব অন্তরালে প্রকাশ করিতেছে। তানকর্তবের যোগে এই অখণ্ড ভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। তবে যেখানে ভাবের জন্য প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন সেখানে খেয়ালাঙ্গ (এবং অন্যান্য গানেও) গানের স্বরের কাঠামোতেই কবি তান ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন 'কার বাঁশী নিশিভোরে বাজিল' গানটির স্থায়ীর 'ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণ-কলিকা' অংশের 'কলিকা' শব্দটিতে যে তান প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নিবিষ্ট মনোযোগ সহকারে শুনিলে বুঝা যাইবে শরতের মধুর প্রাতঃকালে অরুণকিরণচ্ছটার দিগন্তে বিচ্ছুরিত হওয়ার ভাব আশ্চর্যরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছে। পূজা ও প্রকৃতি পর্যায় ব্যতীত অন্যান্য পর্যায়ে খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া না। হিন্দুস্থানী খেয়ালের মতই রবীন্দ্রনাথের খেয়ালাঙ্গ গান স্থায়ী ও অন্তরা এই দুই কলিযুক্ত।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে টপ্পার প্রভাব অপেক্ষাকৃত সীমিত। মূল টপ্পা গানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ অল্প কয়েকটি গান রচনা করিয়াছেন। টপ্পায় যে বিশেষ ধরণের অলঙ্করণ বহুলভাবে প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বলা হয় 'জমজমা'। ধ্রুপদ ও খেয়ালের তুলনায় টপ্পা অপেক্ষাকৃত লঘু শ্রেণীর গান। তাহার জন্য কতকগুলি রাগ ও তাল নির্দিষ্ট আছে। ফলে মূল টপ্পাগুলি মুখ্যত মধুর রসেরই উপস্থাপনা করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-অঙ্গের গানগুলি সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। জমজমা অলঙ্করণের বাহুল্যের ফলে গানের কথাগুলি ব্যক্ত হইবার সুযোগ পায় না—বস্তুত চাপা-ই পড়ে যায়। কাফী রাগের এই টপ্পা গানটি উল্লেখ করা যায়—

হোমীয়া জানেবালে তান্থু অল্লাদি কসম
ফিরিয়া লেন্নুবালে ॥
আঁদা জাঁদা তুসী মনলে জাঁদে আবো সজন ঘরে
শরশা লগদা হো মতবালে ॥

এই গানটির আদর্শে রবীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছেন—

এ পরবাসে রবে কে হায় !
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে ॥

একটি মূল টপ্পার আদর্শে গানটি রচিত। ইহা ছাড়াও টপ্পার অলঙ্করণ প্রয়োগ হইয়াছে এমন বিশেষ বিশেষ রবীন্দ্রসঙ্গীতও আছে। যেমন—

সার্থক জনম আমার
আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার। ইত্যাদি

ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতে অন্যান্য শ্রেণীর গানের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

॥ রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের আলোচনা ॥

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের গান বহুমুখী। গীতবিতানের পূজা অংশের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলির নাম হইল, গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা, সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়। এই অংশেই বিখ্যাত স্বদেশী গানগুলি রহিয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রেম পর্যায়ে আছে প্রেমবৈচিত্র্য ও বিভিন্ন ঋতু বা প্রকৃতি বিষয়ক গান। ইহা ছাড়া এই ভাগের বিচিত্র অংশে এমন বহু গান আছে যাহা বিষয়ের দিক হইতে উপরের কোনটির মধ্যে স্থান পায় না। লিরিক কবিতা হিসাবে এই সকল গান বাংলার চিরকালের সম্পদরূপে গণ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া ছয়টি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য রচনা করিয়া বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছেন। আরো এমন কতকগুলি বিষয়ে গান রচনা করিয়াছেন যাহা লইয়া গান রচনার কথা তাঁহার আগে কেহই

চিন্তাই করে নাই। যেমন—খেলার গান, চলার গান, পথের গান, জন্মদিনের গান, বিবাহের গান, মৃত্যুলোকের শান্তির গান, চাষ করার গান, ধান কাটার গান, গৃহপ্রবেশের গান, চায়ের গান, হাসিঠাট্টার গান, তৃষ্ণার জলের গান, দীনের হইতে দীন যে মানুষ তাহাদের প্রতি সমবেদনার গান, ইহা ছাড়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসবের উপযোগী গান। এইরূপে মানুষের কঠোর বাস্তব জীবনকে নানা দিক হইতে সঙ্গীতরসে সিঞ্চিত করিবার চেষ্টা বাংলাদেশে আর কোন গীতিকার করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে কিছু বলিলেই অনেকে মনে করেন যে সেগুলি হিন্দুস্থানী গান-ভাঙা। ভাঙা গান থাকিলেও সব নয় এই পর্যায়ে কবিগুরুর নিজস্ব রচনাও বহু আছে। এই গানগুলি গায়ন পদ্ধতির প্রভেদ আছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত হইলেও তান বিস্তার সহযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের রীতি নাই। তাহার একমাত্র কারণ কাব্যাংশকে উপেক্ষিত না করা। তবে আঙ্গিক ও গঠন প্রকৃতির বিচারে ইহা সর্বসম্মতভাবে শাস্ত্র সম্মত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ১০টি ঠাটের অন্তর্গত প্রায় সকল প্রধান রাগেই রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। রাগরাগিণীর ক্ষেত্রে যেমন তালের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গীত রচনায় প্রায় সবই প্রচলিত তাল ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চ এই ছয়টি তাল রবীন্দ্রনাথ নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন। বাংলা লোকগীতির বাউল, ভাটিয়ালী, সারি গানের সুরের কাঠামোয় এবং কীর্তনের সুর প্রভাবিত বহু গান রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রচনায় স্থান পাইয়াছে, মহীশূরী, কর্ণাটি, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরে রচিত বেশ কিছু গান।

কাব্যধর্মী পর্যায়ে প্রথমেই বলিতে হয় ধর্ম সঙ্গীতের কথা—সংখ্যার বিচারে এই পর্যায়টি যেমন প্রথম, বৈচিত্র্যের প্রশ্নেও ইহা অদ্বিতীয়। সংখ্যার বিচারে দ্বিতীয় স্থান প্রেমসঙ্গীতের। এই পর্যায়ের গানে মানব প্রেমের বিভিন্ন অনুভূতি, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রেম সঞ্চার, বিরহ মিলন লইয়া যে কল্পলোক সৃষ্ট তাহা যেন

আমাদের সবারই জানা। সংখ্যার বিচারে তৃতীয় স্থান ঋতু সঙ্গীতের। তৃতীয় স্থানের অধিকারী হইলেও এই পর্যায়ের গানগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠতম রচনার অন্যতম। ছয়টি ঋতু লইয়া ঋতুচক্রের যে আবর্তন তাহা আমাদের বাংলা দেশের মতো আর কোথায় আছে? আমরাও কি পূর্বে অনুভব করিয়াছি প্রতিটি ঋতুর স্বতন্ত্র রূপ ও প্রকৃতির? এই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির কবি বলা হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুকে রবীন্দ্রনাথ তুলনা করিয়াছেন 'মৌনী-তাপস' ও রুদ্র-ভৈরবের সহিত—ইহার তাপদাহকে অনুভব করিয়াছেন তপোবহ্নির শিখার ন্যায়। বর্ষা ঋতুকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন সংসারী, গৃহী -- যাহা আমাদের মনকে একই স্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে। কবির বর্ষা সঙ্গীত রচনায় আমরা এই ঋতুর চারিটি প্রাকৃতিক রূপ পাইয়াছি যাহা হইল মেঘ-সঞ্চার, নববর্ষা, বর্ষণ ও শেষ-বরষার বিবরণ। ঋতুচক্রের তৃতীয় প্রকৃতি শরৎ—এই ঋতুকে রবীন্দ্রনাথ নিঃসম্বল সন্ন্যাসীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। হেমন্তকে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করিয়াছেন পরিপূর্ণ রিক্ততায় ভরা শীত ঋতুর কুহেলিবিলীন পটভূমিকা রূপে। শীত ঋতুতে আমরা পাই শূন্যতার বর্ণনা, যাহাকে কবিগুরু শুষ্ক আসনে আসীন সন্ন্যাসীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইহার পরই প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ঋতুরাজ বসন্ত—যাহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন উদাসীন, গৃহত্যাগী, যে আমাদের মনকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, যে আমাদের মনকে অন্তঃপুর হইতে বাহিরে লইয়া যায়।

ভানুসিংহের ছদ্মনামে কবিগুরু অল্প বয়সে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে যে গানগুলি রচনা করিয়াছেন সেগুলি স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য সঙ্গীত রচনা হইতে স্বতন্ত্র। ভানুসিংহের পদাবলীর অন্তর্গত গানগুলির বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা, সুর কীর্তনাঙ্গ ও ব্রজবুলী ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ রচিত গীতিনাট্যের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' যেমন বয়স্কদের জন্য তেমনি নির্দিষ্ট রহিয়াছে 'কালমৃগয়া' শিশুদের জন্য। সংখ্যায় অল্প হইলেও এই পর্যায়ভুক্ত গানগুলির একটা বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে।

॥ আকারমাত্রিক স্বরলিপি ও ভাতখণ্ডে স্বরলিপির তুলনা ॥

আকারমাত্রিক স্বরলিপি	ভাতখণ্ডে স্বরলিপি
[১] ৭টি শুদ্ধ স্বর-স র গ ম প ধ ন।	[১] ৭টি শুদ্ধ স্বর-সা রে গ ম প ধ নি।
[২] ৫টি বিকৃত স্বর—ঋ জ্ঞ হ্ম দ ণ।	[২] পাঁচটি বিকৃত স্বর— রে গ ম॑ ধ নি।
[৩] মন্দ্র সপ্তকের স্বরের নীচে হসন্ত বসে। যথা: ম্‌া প্‌া ধ্‌া ন্‌া।	[৩] মন্দ্র সপ্তকের স্বরের নীচে বিন্দু বসে। যথা: ম় প় ধ় নি়।
[৪] মধ্য সপ্তকের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা: গা মা পা ধা।	[৪] মধ্য সপ্তকের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা: গ ম প ধ।
[৫] তার সপ্তকের মাথায় রেফ বসে। যথা: র্সা র্রা র্গা র্মা।	[৫] তার সপ্তকেব মাথায় বিন্দু বসে। যথা: সা̇ রে̇ গ̇ ম̇।
[৬] প্রতিটি স্বর একমাত্রা। যথা: সা রা গা মা।	[৬] প্রতিটি স্বর একমাত্রা। যথা: সা রে গ ম।
[৭] দুইটি স্বর মিলিয়া একমাত্রা। যথা: সরা।	[৭] দুইটি স্বর মিলিয়া একমাত্রা। যথা: সারে।
[৮] চারিটি স্বর মিলিয়া একমাত্রা। যথা: সরগমা।	[৮] চারিটি স্বর মিলিয়া একমাত্রা যথা: সারেগম।
[৯] একটি স্বর দুইমাত্রা। যথা: গা -া।	[৯] একটি স্বর দুই মাত্রা। যথা: গ-
[১০] একটি স্বর চারি মাত্রা। যথা: গা-া-া-া।	[১০] একটি স্বর চারিমাত্রা। যথা: সা- - -।
[১১] তাল বিভাগের চিহ্ন পাশে '।' এইরূপ দাঁড়ি বসে। '০' এইরূপ	[১১] '।' এইরূপ দাঁড়ি দ্বারা তালের বিভাগ বুঝান হয়। '×' এইরূপ

শূণ্য থাকিলে ফাঁক বুঝিতে হইবে এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে (১´, ২´) এইরূপ রেফ চিহ্ন থাকিবে তাহাকেই সম বুঝিতে হইবে। সম হইতে পরের সময় পর্যন্ত একফেরা গাওয়া হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে 'I' এইরূপ দণ্ড বসে। প্রতিটি কলির প্রথমে এবং শেষে 'II' এইরূপ দুইটি দণ্ড বসে এবং গান একেবারে শেষ হইয়া গেলে 'II II' এইরূপ চারিটি দণ্ড বসে। অবসানের চিহ্ন স্বরের মাথায় "সা̇" এইরূপ যুগল দাঁড়ি বসে। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন '{ }' এইরূপ গুম্ফ বন্ধনী এবং পুনরাবৃত্তকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্নস্বরূপ '( )' এইরূপ বক্র বন্ধনী বসে।

ক্রস চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়। '০' এইরূপ শূণ্য দ্বারা খালী বা ফাঁক বুঝান হয়। ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা তালী বা তাল বুঝান হয়।

[১২] মীড়ের চিহ্ন স্বরের নীচে '‿' এই অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে। যথা: পা পা।

[১২] মীড়ের চিহ্ন স্বরের মাথায় '⁀' এই অর্ধবৃত্তকার চিহ্ন বসে। যথা: প গ।

[১৩] কণ বা স্পর্শ স্বর মূল স্বরের বামদিকে ছোট অক্ষরে লিখিত হয়। যথা: রগা পমা।

[১৩] কণ বা স্পর্শ স্বর মূল স্বরের মাথায় ছোট আকারে লেখা থাকে। যথা: ম/প প/ধ।

[১৪] যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না ; তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বাম পার্শ্বে (-) এইরূপ হাইফেন বসে এবং গানের পংক্তিতে (০) এইরূপ শূণ্য দেওয়া হয়। যথা : সা -া -া -া । সা -রা -গা -মা । মা ০ ০ ০ অথবা মা ০ ০ ০	[১৪] যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না তখন স্বরের ডানদিকে (—) এইরূপ ড্যাস বসে ও গানের পংক্তিতে (s) এইরূপ অবগ্রহ বসে। যথা : সা — — — মা s s s।

॥ আকারমাত্রিক ও বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপির তুলনা ॥

আকারমাত্রিক স্বরলিপি	বিষ্ণুদিগম্বর স্বরলিপি
[১] ৭টি শুদ্ধ স্বর—স র গ ম প ধ ন।	[১] ৭টি শুদ্ধ স্বর-সা রে গ ম প ধ নি।
[২] চারিটি কোমল স্বর—ঋ জ্ঞ দ ণ।	[২] চারিটি কোমল স্বর—রে্ গ্ ধ্ নি্।
[৩] একটি তীব্র স্বর—হ্ম।	[৩] একটি তীব্র স্বর—ম/।
[৪] মন্দ্র বা উদারা সপ্তকের স্বরের নীচে হসন্ত বসে। যথা : ম্া প্া ধ্া ন্া।	[৪] মন্দ্র সপ্তকের স্বরের মাথায় বিন্দু বসে। যথা : রে গং ম প।
[৫] মধ্য বা মুদারা সপ্তকের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা : গা মা পা ধা।	[৫] মধ্য সপ্তকের কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই। যথা : গ ম প ধ।
[৬] তার বা উচ্চ সপ্তকের স্বরের মাথায় রেফ বসে। যথা : র্সা র্রা র্গা র্মা।	[৬] তার সপ্তকের স্বরের মাথায় লম্ব দাঁড়ি বসে। যথা : গ ম প ধ।
[৭] প্রতিটি স্বর একমাত্রা। যথা : সা রা গা মা।	[৭] প্রতিটি স্বর একমাত্রা। সা রে গ ম।

[৮] এক একটি স্বর অর্ধমাত্রা। যথা: সঃ রঃ।

[৯] এক একটি স্বর সিকিমাত্রা। যথা: সরগমা।

[১০] একটি স্বর দুই মাত্রা। যথা: রা া গা া।

[১১] একটি স্বর চারিটি মাত্রা। যথা: গা া া া । মা া া া।

[১২] তাল বিভাগের চিহ্ন পাশে '।' এইরূপ দাঁড়ি বসে। '০' এইরূপ শূণ্য থাকিলে ফাঁক বুঝিতে হইবে এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে (১´ ২´) এইরূপ রেফ চিহ্ন থাকিবে তাহাকেই সম্ বুঝিতে হইবে। সম হইতে পরের সম্ পর্যন্ত এক ফেরা গাওয়া হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে 'I' এইরূপ দণ্ড বসে। প্রতিটি কলির প্রথমে এবং শেষে 'II' এইরূপ দুইটি দণ্ড বসে এবং গান একেবারে শেষ হইয়া গেলে 'II II' এইরূপ চারিটি দণ্ড বসে। অবসানের চিহ্ন স্বরের মাথায় 'সা̎' এইরূপ যুগল দাঁড়ি বসে।

[৮] এক একটি স্বর অর্ধ মাত্রা। যথা: সা রে।
০ ০

[৯] এক একটি স্বর সিকি মাত্রা। যথা: সা রে গ ম । (each with a curve mark beneath)

[১০] এক একটি স্বর দুই মাত্রা। যথা: রে, গ ।
ഗ ഗ

[১১] একটি স্বর চারি মাত্রা। যথা: গ, ম।
× ×

[১২] '।' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা তাল বিভাগ বুঝান হয়।

'১' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা সম্ বুঝান হয়। '+' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা ফাঁক বুঝান হয়। সম্ ও ফাঁক ভিন্ন অন্য বিভাগগুলিতে মাত্রার সংখ্যা দেওয়া হয়।

পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } এইরূপ গুম্ফ বন্ধনী এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্নস্বরূপ ( ) এইরূপ বক্র বন্ধনী বসে।

[১৩] মীড়ের চিহ্ন স্বরের নীচে '‿' এইরূপ অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে। যথা : ণা পা।

[১৩] মীড়ের চিহ্ন স্বরের মাথায় '⁀' এইরূপ অর্ধবৃত্তাকার চিহ্ন বসে। যথা : প রে।

[১৪] কণ বা স্পর্শ স্বর—মূল স্বরের বামপার্শ্বে ছোট অক্ষরে লিখিত হয়। যথা : রগা গম্মা।

[১৪] কণ বা স্পর্শ স্বর স্বরের মাথায় লেখা থাকে। যথা :
ম প
প ধ।

[১৫] যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না; তখন সেই স্বর বা স্বরগুলির বামপার্শ্বে (-) এইরূপ হাইফেন বসে এবং গানের পংক্তিতে (০) এইরূপ শূণ্য দেওয়া হয় যথা :

সা -া -া -া। সা -রা -গা -মা।
মা ০ ০ ০ অথবা মা ০ ০ ০

[১৫] যখন স্বরের নীচে গানের অক্ষর থাকে না তখন স্বরের ডানদিকে (s) এই চিহ্ন বসে ও গানের পংক্তিতে (০) এইরূপ শূন্য বসে। যথা

ম s s সা।
শ্যা ০ ০ ম

॥ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ॥

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের জন্ম ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিন বোম্বাইয়ের নিকট বালকেশ্বর নামক স্থানে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা একজন মহান সঙ্গীতপ্রেমিক ছিলেন। ভাতখণ্ডেজী পিতার নিকটেই সঙ্গীত শিক্ষার প্রেরণা পান। তিনি বিদ্যালয়ের পড়াশুনার সঙ্গে

সঙ্গেই সঙ্গীত চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি সেতার, গান ও বাঁশীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শেঠ বল্লভদাসের নিকট সেতার, গুরুরাবজী বুয়া, বেলবাথকর, জয়পুরের মুহম্মদআলী খাঁ, গোয়ালিয়রের পণ্ডিত একনাথ, রামপুরের কল্বে আলী খাঁ প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদের নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন। সন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বি. এ. ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর কিছুদিন ওকালতী করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় তাঁহার মন বসিল না। তিনি সঙ্গীতকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতে থাকেন। যেখানে তৎকালীন কোন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ পাইয়াছেন তাঁহার সহিত মিলিয়া, মিশিয়া, তাঁহাকে সেবা করিয়া বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে সঙ্গীত শিক্ষালাভের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট হইতে শিক্ষা করা গান একত্র করিয়া উহাদের স্বরলিপি করিয়া 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা' নামে ছয়ভাগে রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভাতখণ্ডেজী ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতকে শাস্ত্ররূপ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে এক নবীন স্বরলিপি পদ্ধতি রচনা করেন, যাহা আধুনিককালে উত্তরভারতের অধিকাংশ সঙ্গীতশাস্ত্রী দ্বারা মান্য হয়। ইহার অতিরিক্ত রাগ বর্গীকরণের এক নবীন রূপ তিনিই কল্পনা করেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলিত সমস্ত রাগকে দশ ঠাটে বিভাজন করিয়াছেন।

যখন ভারতবর্ষে রেডিওর প্রচলন হয় নাই, সেই সময় সঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশ্যে সঙ্গীত সম্মেলনের কল্পনা তিনিই প্রথম করিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বরোদার রাজা নরেশের সহায়তায় প্রথম সঙ্গীত সম্মেলন আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে অখিল ভারতীয় সঙ্গীত একাডেমি স্থাপন করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং উহা শীঘ্রই স্থাপিত হয়। এই সম্মেলনে ভাতখণ্ডেজী ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিষয়ে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণ ইংরাজীতে "এ শর্ট হিষ্টোরিক্যাল সার্ভে অব দি

মিউজিক অফ আপার ইণ্ডিয়া (A Short historical survey of the Music of upper India) নামে প্রকাশিত হয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আরো পাঁচটি বৃহৎ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন তিনি করেন। তিনি শেষ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেন লক্ষ্ণৌতে। ইহার উদ্দেশ্যে ছিল যে তিনি এখানে একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় ও লক্ষ্ণৌ মরিস মিউজিক কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজ বর্তমানে ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ নামে তাঁহারই পুণ্য স্মৃতি বহন করিতেছে। ইহা ছাড়া গোয়ালিয়রে গান্ধর্ব সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় নামে আর একটি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেন। তিনি সঙ্গীত বিষয়ক বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি, ক্রমিক পুস্তক মালিকা (ছয়ভাগে) ভাতখণ্ডে সঙ্গীতশাস্ত্র (চারভাগে) অভিনব রাগমঞ্জরী, লক্ষ্যসঙ্গীত, স্বরমালিকা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাতখণ্ডেজী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় সঙ্গীতের সেবা করিয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে পদ্মশ্রী শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনঝঙ্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর ॥

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে মহারাষ্ট্রের কুরুন্দবাড়ের নিকট বেলগাঁও নামক স্থানে পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্করের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল দিগম্বর গোপাল ও মাতার নাম ছিল গঙ্গা দেবী। দিগম্বর গোপাল গরীব ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হরিকীর্তন গাহিতেন। দীপাবলী উৎসবের সময় বাজী পোড়াইতে গিয়া বিষ্ণুদিগম্বর দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন, ফলে তাঁহাকে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া মীরজের তৎকালীন সঙ্গীতাচার্য পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বুয়ার নিকট ১২ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। মীরজের মহারাজ পণ্ডিতজীর প্রতিভা দেখিয়া মুগ্ধ

হন ও পণ্ডিতজীকে আশ্রয় যেন। একবার মীরজে এক সার্বজনীন সভা হয় এবং এই সভায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হন। তিনি নিজেও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গীতগুরু বালকৃষ্ণ বুয়াকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই। আমন্ত্রণ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এক আশ্চর্যজনক উত্তর মিলিল ; যেহেতু তিনি গায়ক সেই কারণে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই। এই কথা শুনিয়া পণ্ডিতজী প্রাণে বড ব্যথা পান। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সঙ্গীতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সব সুখ স্বাচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীত প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন এবং বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তিনি এক অভিনব স্বরলিপি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া সঙ্গীত বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থের মধ্যে সঙ্গীত বালপ্রকাশ, সঙ্গীতবালবোধ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীত বিত্যালয় স্থাপন করিয়া বিত্যালয়ের মাধ্যমে বিত্যার্থীদের সঙ্গীত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে লাহোরে তিনি প্রথম গান্ধর্ব সঙ্গীত বিত্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতজী বোম্বাইতে গান্ধর্ব বিত্যালয়ের আর একটি শাখা স্থাপন করেন। এখানে লাহোরের তুলনায় আরও বেশী সফল হন। পণ্ডিতজী শেষ জীবনে রাম নামে আকৃষ্ট হন। তিনি গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' এই গান গাহিয়া বেড়াইতে থাকেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নাসিক নামক স্থানে 'রামনাম আশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বৈদিক যুগের আশ্রম প্রণালী অনুযায়ী শিষ্য মণ্ডলী তৈয়ারী করেন। শিষ্যরা পণ্ডিতজীর সঙ্গেই থাকিতেন। ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত বিনায়ক রাও পটবর্ধন, নারায়ণ রাও ব্যাস, ঠকারজী প্রভৃতি বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত নায়কগণ তাঁহারই সুযোগ্য শিষ্য ও সুবিখ্যাত সুকণ্ঠ গায়ক ডি. ভি. পলুস্কর তাঁহারই সুযোগ্য পুত্র। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট মীরজে পণ্ডিতজী দেহত্যাগ করেন।
